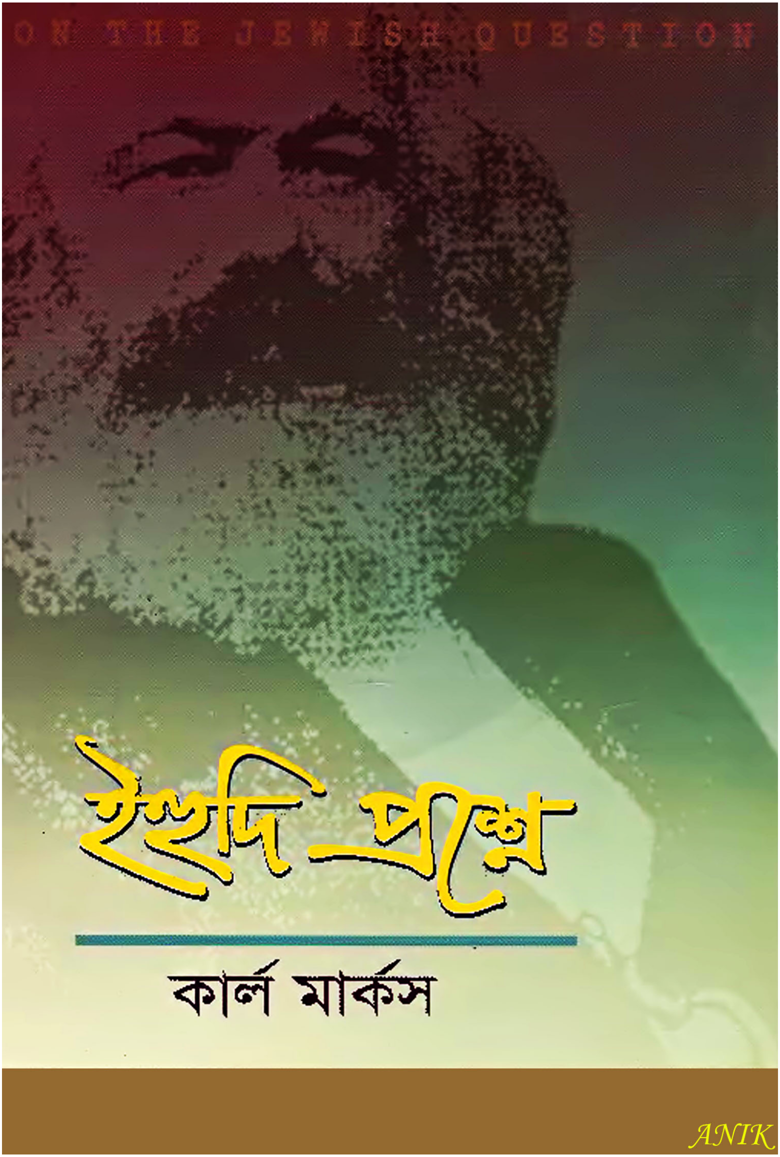
ON THE JEWISH QUESTION
ইহুদি প্রশ্নে
কার্ল মার্কস
ANIK

"....কে মুক্ত করবে?
কাকে মুক্ত করতে হবে?
শুধু এটুকু অনুসন্ধান করাই যথেষ্ট ছিল না।
অনুসন্ধান করতে হতো যে,
প্রশ্নটা কোন ধরনের মুক্তির?
যে রকম মুক্তি দাবি করা হচ্ছে
তার একেবারে নিজের স্বভাব হতে
কি শর্তাদি বের হয়ে আসে?
একমাত্র খোদ রাজনৈতিক মুক্তির
সমালোচনাই হতে পারতো
ইহুদি প্রশ্নের সিদ্ধান্তমূলক সমালোচনা আর
'কালের সাধারণ প্রশ্ন'-এর
বাস্তব যোগসাধন।"

সংহতি

দাম : পঁচাত্তর টাকা

ISBN 984-70046-0011-6

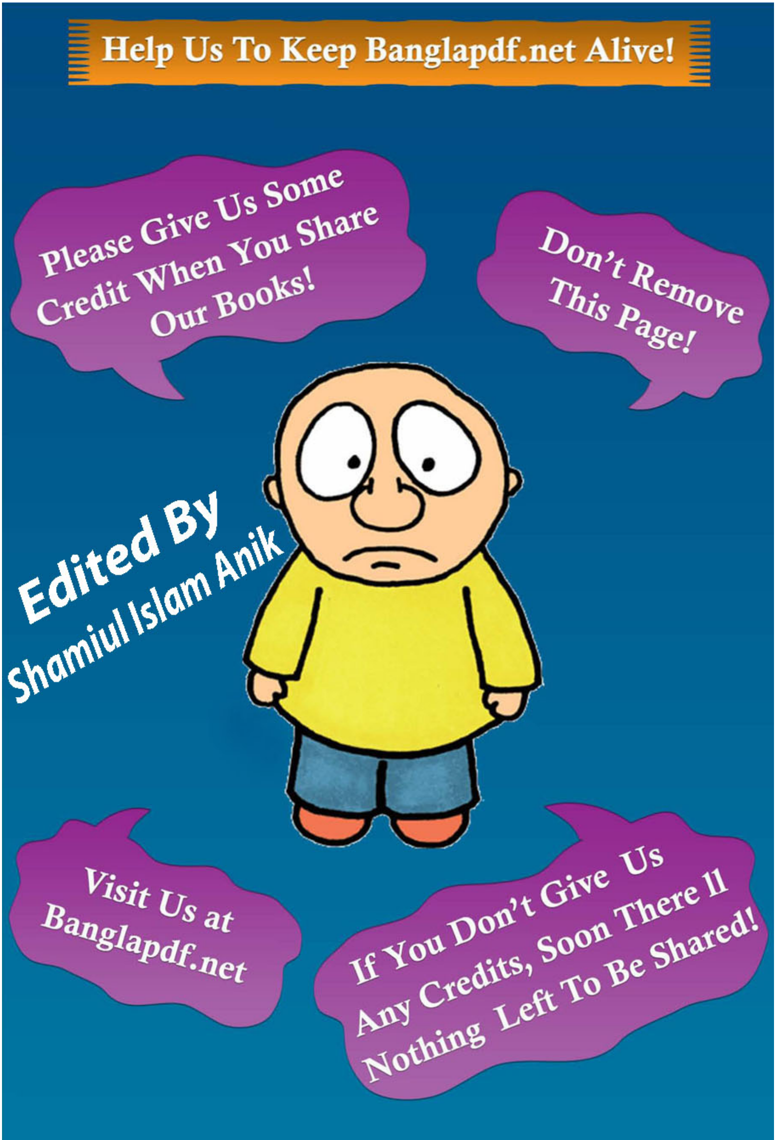
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Edited By Shamiul Islam Anik
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কার্ল মার্কস

ইহুদি প্রশ্নে

ভাষান্তর জাভেদ হুসেন

বাংলাদেশ অনুবাদ সংসদের পক্ষে

সংহতি

১৪১৫

ইহুদি প্রশ্নে
প্রথম বাংলা সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
অনুবাদ স্বত্ব জাভেদ হুসেন

প্রকাশক
সংহতি প্রকাশন
৯০ আজিজ সুপার মার্কেট
তৃতীয় তলা, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ
৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শ্রাবণ প্রকাশনী
২৮ আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
অমল আকাশ
অক্ষর বিন্যাস
সাজিদ তৌহিদ
মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স, ৬৭/ডি গ্রিনরোড, পান্থপথ, ঢাকা ১২০৫

দাম
পঁচাত্তর টাকা বিদেশ ৩ ডলার

AEHUDI PROSHNE
Bangla translation of *On the Jewish Question by* Karl Marx. Translated by Zaved Hussain.
Published by Samhati Prokashan (Samhati Publications)
on behalf of Bangladesh Anubad Samsad.
For information, address Samhati Publications, 90 Aziz Supermarket (2nd floor),
Shahbag, Dhaka-1000. e-mail samhatiprokashan@yahoo.com
Cover Design : Amal Akash. Price Tk. 75.00 US $ 3.00

ISBN 984-70046-0011-6

সূচিপত্র

প্রকাশনা প্রসঙ্গে ৭

ভাষান্তর প্রসঙ্গে ৯

ভূমিকা ১০

ইহুদি প্রশ্নে কার্ল মার্কস

১. ব্রুনো বাউয়ের, ইহুদি প্রশ্ন ব্রনশভিগ, ১৮৪৩ ২৫

২. ব্রুনো বাউয়ের, "বর্তমান দিনের ইহুদি এবং খ্রিষ্টানের স্বাধীন হওয়ার সামর্থ্য।" (পৃষ্ঠা-৫৬-৭১) ৫৩

পরিভাষা পরিচয় ৬১

নির্ঘণ্ট ৯৩

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে *বাংলাদেশ অনুবাদ সংসদের* নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে আমরা *ইহুদি প্রশ্নে* গ্রন্থটি প্রকাশ করছি। সংসদের এটি দ্বিতীয় প্রকাশনা। কলেবরে ছোট হলেও, কার্ল মার্কস রচিত এই গ্রন্থটি রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে খুবই মূল্যবান এক সম্পদ। রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক বিচার, বিশেষত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (মার্কসের ভাষায় রাজনৈতিক মুক্তির কালে) সুনির্দিষ্ট ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের একেবারে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস। শুধু তাই নয়, সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকাকেও মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন পরিপূর্ণ নির্দিষ্টতায়। রাষ্ট্র সেক্যুলার হলেও যে সমাজ তখনো ধর্মের প্রভাবেই থেকে যায়, রাজনৈতিক মুক্তি সমাজ বিকাশের একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হলেও সেটা যে মানুষের সার্বিক মুক্তির চূড়ান্ত রূপ নয়, এসব প্রশ্ন আলোচনা করে মার্কস ইহুদি সমস্যা এবং ইহুদিবাদকে ঐতিহাসিক সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করে তারই নির্দিষ্ট রূপ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস ইহুদি প্রশ্নের যে সমাধানসূত্র দিয়েছেন তা কেবল ঐ কালেই নয়, বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও এক সুস্পষ্ট দিশা হিসেবে হাজির আছে। এই গ্রন্থের যে সাধারণ রাজনৈতিক তাৎপর্য তা আজকের কালেও সারা দুনিয়ায় এবং আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অপরিহার্য।

গ্রন্থটির অনুবাদক জাভেদ হুসেন লেখক এবং নিয়মিত অনুবাদ কর্মে সক্রিয়। অনুবাদ বিষয়ে আমরা কেবল অনুবাদের প্রামাণিকতার দিকে খেয়াল রাখতে সচেষ্ট। অনুবাদের ভাষারীতি অনুবাদকের নিজস্ব। গ্রন্থটির প্রকাশনা ও বিতরণে সংহতি প্রকাশন আমাদের সহযোগী।

বিদ্যায়তন ও সাধারণ বিদ্যোৎসাহী মহলে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে গ্রন্থটি প্রভাব ফেলবে বলে আমরা আশা রাখি। গ্রন্থটিকে আরো নির্ভুল করে তুলতে পাঠকের পরামর্শ আকাঙ্ক্ষিত।

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ অনুবাদ সংসদ
bdanubadsamsad@gmail.com

ভাষান্তর প্রসঙ্গে

এখানে কার্ল মার্কস রচিত *ইহুদি প্রশ্নে* সম্পূর্ণ রচনাটির বাংলা ভাষান্তর ছাপানো হয়েছে। ইংরেজি হতে ভাষান্তরের জন্য মূলত দুটি সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে—Karl Marx: Early Writings, Translated by Rodney Livingstone and Gregor Benton, Published by Penguin Books, First Edition 1975 এর Gregor Benton-এর অনুবাদ এবং মস্কো হতে প্রকাশিত Marx-Engels এর ৩য় খণ্ডের অনুবাদখানি। ভিন্ন ভাষান্তরের মাঝের বেমিল বুঝতে Abram Leon এর The Jewish Question, A Marxist Interpretation কাজে লেগেছে।

মার্কস প্রদত্ত নজরটান মস্কো সংস্করণ অনুযায়ী রক্ষিত হয়েছে।

বাক্যের গঠন বাংলার আদতে পাল্টাতে হয়েছে। একমাত্র এই পথেই দীর্ঘ বাক্যগুলো জটিলতা এড়ানো যেত। ফলে প্যারাগ্রাফের বাক্যগুলো সংযোগমূলক বাক্য হিসেবে পড়া বিধেয়। অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন বাক্য সম্পূর্ণ প্রত্যয়মূলক অর্থবোধ তৈরি না করবার আশঙ্কা মনে রেখে পড়তে হবে।

বিশেষ শব্দ যেখানে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, সেখানে তা বাক্যের দিক এবং বাংলা প্রকরণের মৌখিক বাক্যবন্ধের অনুযায়ী লিখবার চেষ্টা করা হয়েছে। রচনায় ব্যবহৃত টেকনিক্যাল শব্দ এবং পরিভাষা চিহ্নিত করে একটি নির্দিষ্ট কোষ দেয়া আছে। এতে মূল রচনায় ব্যবহৃত শব্দ ও পরিভাষাগুলো মার্কসের নজর দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে তাঁর রচনাবলী হতেই ঐ পদগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া আছে। সতর্কভাবে এই ধারণাগুলোর অনুধাবন ছাড়া মূল রচনার অর্থবোধ বিঘ্নিত হবে।

জাভেদ হুসেন
ঢাকা

ভূমিকা

০১.

'ইহুদি প্রশ্নে' মার্কস রচনা করেন ২৫ বছর বয়সে। বয়সটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মার্কসের জীবনের প্রথমদিকের রচনাবলী গতানুগতিক মার্কস চর্চায় বরাবরই ছক বাঁধা পথে এগোনোতে ঝামেলা বাঁধিয়েছে। অর্থনৈতিক ভিতকে মার্কস যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন তার বদলে এমনকি মার্কস অনুসারীদের অনেকের কাজেকর্মে বুর্জোয়া অর্থে শুধু পণ্য বিনিময়ের স্তরেই এই ধারণাকে সীমাবদ্ধ রাখার ঝোঁক প্রবল। ফলে মার্কসের শিক্ষা বহুলাংশেই যেন অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যা বলে বোধ হয়। এঙ্গেলস নিজে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ১৮৯০ সালে জোসেফ ব্লখের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি এ ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলেছেন—

মিথস্ক্রিয়ায় অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়ার মতো সময়, জায়গা বা সুযোগ সব সময় আমরা পাইনি।' প্রতিটি মানুষই তো তার কালের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। ফলে বর্তমান চারপাশের বহু ঝামেলা অনেক মৌলিক প্রশ্নকে আড়াল করে দেয়। কার্ল মার্কসও এর বাইরে ছিলেন না। তবে তাঁর জীবনের প্রথমদিককার রচনাতে যে সার্বিকতা পাওয়া যায় তা আলোচনার বাইরে থেকে যাওয়াতে মানুষ জীবনের বহু মৌলিক প্রশ্ন মার্কস চর্চাকারীদের অনেককে হয় নিশ্চুপ রাখে, এড়িয়ে যেতে বাধ্য করে নয়তো এলোমেলো পথে ঘোরায়। ফলে ইতিহাস বদলের মার্কসের প্রস্তাবনা নিতান্ত অর্থনীতিবাদী রাজনৈতিক বিপ্লবের স্তরে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এই সমস্যার জন্য আমাদের আলস্যও দায়ী। মার্কসের দেয়া ভুবনদৃষ্টি স্থান, কাল অনুযায়ী বিকশিত করবার দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে যা হচ্ছে তাই হওয়ার কথা।

আসলে মানুষ কোনো কিছু তৈরি করবার আগে তার একটা রূপ তার

মাথাতেই থাকে। বহাল বিশ্বব্যবস্থা শব্দ, ধারণার যে বোধ তৈরি করে তাকে নতুন করে বুঝে নেয়া ছাড়া বদলানোর ভাবনা বাতুলতা, ক্রিয়া অর্থহীন। মার্কসের প্রাথমিক রচনাবলী জগতকে ব্যাখ্যা করবার যে নতুন শব্দ বোধ তৈরি করেছে তাকে পাঠ করা এজন্যই অনিবার্য। 'ইহুদি প্রশ্নে' সেই অর্থে রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্ম, ব্যক্তি, মানুষ ও টাকার সম্পর্ক বিচারে যে বিশাল ও নতুন প্রকল্প হাজির করছে তা পুঁজিতন্ত্র বুঝতে পারেনি। পারবেও না, কারণ দুই জগতের দুই ভুবনদৃষ্টি।

এই বিকল্প জগত মাথায় রেখেই মার্কস পাঠ শুরু করা দরকার।

০২.

'ইহুদি প্রশ্নে' লেখা হয়েছিল আধা-সামন্ত জর্মন দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাধারণ লড়াইয়ের অংশ হিসেবে। জর্মন দেশের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো ইহুদিদেরকেও একই নাগরিক অধিকার দেয়া হবে কিনা—এই তর্ক সেই লড়াইয়েরই একটা পরিপ্রেক্ষিত ছিল। মার্কস তখন ছিলেন রাইন গেজেট পত্রিকার সম্পাদক। আসলে মার্কসের ইচ্ছা ছিল হার্মেস নামের একজনের খোলাখুলি ইহুদিবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল লেখালেখির জবাব দেবার। হার্মেস বলতেন, ইহুদিদের বিচরণ সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্রের খ্রিষ্টান ভিত অক্ষুণ্ন রাখার কথা। এমন সময় বামপন্থী হেগেলীয় ঘরানার ব্রুনো বাউয়ের দুটো লেখা নিয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন। লেখা দুটো ছিল 'ইহুদি প্রশ্ন' আর 'বর্তমান কালের ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের মুক্ত হওয়ার সামর্থ্য'। মার্কস বাউয়েরের ছদ্ম র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বাহাস করা বেশি জরুরি মনে করলেন।

মার্কস তখন পারি নগরীতে নির্বাসনে, ফরাসি সাম্যবাদীদের ভাবনা-চিন্তার সাথে যোগ গড়ে উঠছে তাঁর। ১৮৪৩ সালের শেষদিকে তিনি 'হেগেলের আইন দর্শনের পর্যালোচনা'তে প্রলেতারিয়েতকে নতুন সমাজের বাহক বলে নির্দিষ্ট করেন। ১৮৪৪ সালে দেখা হয় এঙ্গেলসের সাথে। এঙ্গেলস তাঁকে সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক ভিত বুঝে নিতে সাহায্য করেন। এ বছরই এ সমস্ত বিষয়গুলো গভীরভাবে বুঝে নেয়ার প্রথম চেষ্টা পাওয়া যায় 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক খসড়া' রচনাতে। ১৮৪৫ সালের ফয়েরবাখ থিসিসে ডাকাবুকো মার্কস দেখা দেন। 'ফ্রাঙ্কো-জর্মন বর্ষপঞ্জী'তে ছাপা

নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে তর্কগুলো এই উত্তরণ কালের ফসল।

এ সময় বাউয়ের ছিলেন জর্মন দেশে বামপন্থার মুখপাত্র। ইহুদি প্রশ্নে তাঁর আপাত র‍্যাডিক্যাল প্রস্তাবনা আসলে ইহুদিদের অবস্থান প্রশ্নে কিছুই না করবার ছুতোতে গিয়ে শেষ হয়। বাউয়েরের মতে, খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে ইহুদিদের রাজনৈতিক মুক্তির ডাক দেয়া অর্থহীন। প্রথমেই দরকার ইহুদি ও খ্রিষ্টান—দুই পক্ষেরই ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরিচয় ত্যাগ করো, খাঁটি মুক্তির দিকে এগোনোর স্বার্থে। কারণ খাঁটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় আদর্শের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। খ্রিষ্টানত্ব হচ্ছে শেষ ধর্মীয় আবরণ যার মাঝে মানব মুক্তির সংগ্রাম নিজেকে ঐতিহাসিকভাবে প্রকাশ করেছে। ইহুদিরা খ্রিষ্টান ধর্মের এই বার্তা গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের পার হতে হবে দুটো ধাপ। খ্রিষ্টানদের জন্য একটাই যথেষ্ট।

মার্কস তর্ক শুরু করেন ইহুদিদের সাধারণ নাগরিক অধিকার প্রদানের পক্ষে দাঁড়িয়ে। এই অধিকারকে তিনি বলছেন, 'রাজনৈতিক মুক্তি', যা কিনা 'সামনের দিকে এক বড় পদক্ষেপ।'

তবে তিনি তখনই বুঝে ফেলেছিলেন, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামই শেষ কথা নয়। নিখুঁত রাজনৈতিক মুক্তি বাস্তব মানব মুক্তি থেকে ঢের দূরে।

এই রচনাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বুর্জোয়া সমাজকে সিভিল সমাজ বলে চিহ্নিত করছেন, যে সমাজে নিঃসঙ্গ সত্ত্বাগুলো বাজারে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে বেড়ায়। এই সমাজ বিচ্ছিন্নতার সমাজ। এখানে মানুষেরই হাতে সৃষ্টি টাকা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা শাসিত মানুষেরই কাছে বিজাতীয় হয়ে পড়ে। এই সমস্যা রাজনৈতিক গণতন্ত্র আর মানুষের অধিকার অর্জন করে সমাধিত হয় না। এর গোড়া লুকিয়ে আছে বিচ্ছিন্ন, টুকরো নাগরিক সত্ত্বায়, যেখানে কোনো বাস্তব সম্প্রদায় বোধ নেই। তার আরো প্রমাণ তিনি দিচ্ছেন উত্তর আমেরিকার উদাহরণ টেনে, যেখানে ধর্ম কেতাবি কায়দায় রাষ্ট্র হতে আলাদা কিন্তু ধর্মীয় শাখা প্রশাখা অসংখ্য।

বাউয়ের যখন বলেন যে, ইহুদিদের রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম কালক্ষয় ছাড়া কিছু নয়—মার্কস তখন বলেন, "আমরা বাউয়েরের মতো ইহুদিদের বলি না: তোমরা ইহুদিবাদ হতে র‍্যাডিকালভাবে নিজেদের মুক্ত না করলে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হতে পারবে না। আমরা বরং তাদের বলি: যেহেতু সম্পূর্ণ এবং পুরোপুরি ইহুদিবাদ পরিত্যাগ না করেও তোমরা রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হতে পারো, সেহেতু রাজনৈতিক মুক্তি নিজে মানবিক মুক্তি নয়। তোমরা

ইহুদিরা যদি নিজেদের মানবিকভাবে মুক্ত না করে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হতে চাও, তবে এই অসম্পূর্ণতা আর দ্বন্দ্বের দায় শুধু তোমাদের নয়, তার জন্য রাজনৈতিক মুক্তির সারসত্ত্বা আর ক্যাটাগরির দিকেও তাকাতে হবে।"

০৩.

অন্তত দুটো কারণে মার্কসের আলোচ্য লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ বিচারে মার্কসের পর্যালোচনা পদ্ধতি এখানে তরতাজা অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, যেভাবে মার্কস ইহুদি প্রশ্নটি উপস্থাপন করেন তার ধরন।

এই তর্কে মার্কসের অবস্থান কি? তিনি যেভাবে সমস্যাটা উপস্থাপন করছেন তা দেখলেই অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়। বাউয়ের পুরো ব্যাপারটার সামনে রেখেছেন ধর্মকে, তাও ধর্মতাত্ত্বিক ঢঙে। কিন্তু মার্কস এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে থামলেন না। 'ইহুদিদের ইহুদি ধর্ম আর মানবজাতির ধর্ম ত্যাগ করা উচিত' এটুকু মার্কসের কাছে অসম্পূর্ণ লেগেছিল। তিনি বললেন, "কে মুক্ত করবে? কাকে মুক্ত করতে হবে?" এটুকু অনুসন্ধান করলেই যথেষ্ট হচ্ছে না। সমালোচনাকে তৃতীয় একটা জায়গা অনুসন্ধান করতে হবে। তা হলো: "প্রশ্নটা কোন ধরনের মুক্তির? দাবি করা মুক্তির খোদ স্বভাবটা হতে কোন সব পরিস্থিতি উদ্ভূত হবে?"

সমস্যাটা তাহলে কে কাকে মুক্ত করবে সেটা নয়। সমস্যাটা হলো মুক্ত করবার চরিত্র কেমন তা।

এদিকে আরেকটা কথা গুরুত্বপূর্ণ। কোন ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষকে নিয়ে বিচারে বসলে ঐ ধর্মের নিখাদ শুদ্ধ রূপ নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। যে রাষ্ট্রে ঐ ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে তার ওপর ভিত্তি করে বিষয়টিও ভিন্ন রূপ ধারণ করে। রাষ্ট্র যদি রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন না করে তাহলে প্রশ্নটিও শুধু ধর্মতাত্ত্বিক থেকে যায়। এই রূপান্তর ঘটে যখন "রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্র নিজেকে ধর্ম হতে মুক্ত করে রাষ্ট্র ধর্ম হতে নিজেকে মুক্ত করে।" তবে রাষ্ট্র ধর্ম হতে ছাড় পেয়ে মানুষ কিন্তু ধর্ম হতে ছাড় পায় না।

রাষ্ট্রের বাইরেও কিন্তু ধর্ম থেকে যায়। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতা পায়, ধর্ম হতে মুক্তি পায় না। রাষ্ট্র যদি নিজেই মোল্লা সেজে বসে থাকে তাহলে ঐ অপূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র এই রাজনৈতিক মুক্তি দিতে পারে না। রাজনৈতিক তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে এই মধ্যবর্তী স্বাধীনতা আনা সম্ভব। এই

স্বাধীনতা কেমন? "একদিকে মানুষকে সিভিল সমাজের সদস্যতে, এক আত্মপরায়ণ, স্বনির্ভর স্বতন্ত্রে নামিয়ে আনা আর অপরদিকে তাকে নাগরিক, ফৌজদারি ব্যক্তিতে পর্যবসিত করা।" এই ক্ষেত্রে তার অধিকার তার বাস্তবতার সাথে গণ্ডগোল শুরু করে। যখন একজন দিনমজুর দেখে নির্বাচনের সময় তার আর সবচেয়ে পয়সাওয়ালার ভোটের অধিকার সমান তখন আসলে তাদের মাঝের বাস্তব বৈষম্যগুলো রাষ্ট্র হাওয়া করে দিতে চায়। কার্যকরী বাস্তবতাগুলো এমনি করে রাষ্ট্র আর নাগরিকের সম্পর্ক বিচারে হাওয়া করে দেয়ার সাথে ধর্মীয় রহস্যবাদের মর্মগত কোনো ফারাক নেই।

রাজনৈতিক মুক্তির আদর্শ আদল আসে তার রাষ্ট্র হতে, বস্তুগত রূপের অবস্থা সে গ্রহণ করে সমাজ হতে। একদিকে সে মানুষকে সিভিল সমাজের সদস্য করে ফেলে অন্যদিকে সে তাকে বাধ্য করে নিজের মাঝে গোটানো ব্যক্তি হতে, যে সংকুচিত তার ব্যক্তি স্বার্থে, ব্যক্তি লোভে, যে নিজের সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন। সমাজ এমনি করেই আত্ম-স্বার্থপরায়ণ ইহুদি তৈরি করে।

টাকা ইহুদিদের খোদা হয়ে উঠেছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই ইহুদি খোদা এখন আর শুধু ইহুদিদের খোদা নেই। সে এখন দুনিয়াব্যাপী ঈশ্বরে পরিণত হয়েছে।

লক্ষণীয়, ঐ কালে ইহুদিদের মাঝে হরেক রকম পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়া চলছিল। মার্কস কিন্তু এর কোনোটাকেই জাতীয়তাবাদী দাবি হিসেবে গ্রাহ্য করেননি। অন্যদিকে কিন্তু তিনি আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ডের জাতিসত্তা আন্দোলন, জর্মন ও ইতালীয় জাতীয় ঐক্য সমর্থন করেছেন। ইহুদিবাদকে তিনি বলছেন 'কিম্ভূত' জাতীয়তা।

ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসের দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নজর করা যায়:

প্রথমত, ধর্মকে তার চারপাশের পরিস্থিতি ও শর্ত দিয়ে বিচার করতে হবে। একই ধর্ম রাষ্ট্র, জাতিভেদে ভিন্ন প্রেক্ষিত হাজির করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম যে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার স্তরে শেকড় গেড়েছে সেই রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এখন স্তর বদল করেছে। সামাজিক স্তর বদলের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কৃতির বদল সমান তালে ঘটে না। ফলে বর্তমানের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বদলের সাথে এই সাংস্কৃতিক বদল সমান তালে ঘটবে না। প্রক্রিয়াটি হবে আরো জটিল।

বাউয়ের যেখানে ইহুদি সমস্যা শুধু ধর্মের দৃষ্টিকোণ হতে দেখছেন

মার্কস তখন বিচারের পাল্লায় নিচ্ছেন দুনিয়াবি যে মানুষেরা ইহুদি নামে পরিচিত তার দিক। তাঁর আলোচনায় ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক প্যাঁচ-পয়জার বাদ যাচ্ছে কিন্তু যে বাস্তব মানুষেরা ঐ তরিকা অনুসরণ করছে তাদের ঐ ধর্ম সংস্কৃতি ভিত্তিক অন্তর্কাঠামো কিন্তু বাস্তব। এই জায়গায় বেহেশত-দোযখের বাস্তবতা বা অবাস্তবতার প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এই ভাবনার পরিকাঠামো যে জাগতিক, বাস্তব শক্তি হয়ে ওঠে তার সাথে চলমান জগতের সংঘাত বা মিলনের সম্পর্কে অনিবার্যভাবে উপযুক্ত গুরুত্ব দাবি করে। গরিব মুসলমান যখন আরব দেশে পেটের দায়ে গায়ে খাটতে গিয়ে আরেক মুসলমান ভাইয়ের মুখে 'মিসকিন' নামে ডাক শুনতে পায়, সেই আবার তার মুসলিম পরিচয়ে বুশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় কেন? এর উত্তরের একটা অংশ নিশ্চয়ই তার ধর্ম, মানে তার অতীত উপরিকাঠামোতে লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ ধর্ম সংস্কৃতি শুধু স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্ন নয়। এই প্রশ্ন উল্টো বিশ্ববীক্ষাকে তার পায়ের ওপর দাঁড় করানোর। এই উপরিকাঠামোকে বিষয়গত বাস্তবতায় বদলানো নিশ্চয়ই ধর্মের সাপেক্ষে মার্কস অনুসারীদের কাজের অংশ।

০৪.

ইহুদিদের বিদ্যমান সমাজেই সম্পূর্ণ অধিকারের সমর্থন করতে গিয়ে মার্কস রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভেবেছেন। এখানে আলাদা করে একেকটা আংশিক মুক্তি বা অধিকার পাওয়া যেতে পারে কিন্তু বিভিন্ন অংশগুলোর অধিকার সংক্রান্ত সংঘাত থামবে না। এই সংঘাতহীন মুক্তি পাওয়া যাবে "যখন মানুষ তার 'নিজের ক্ষমতা' চিনে নেবে, গুছিয়ে নেবে সামাজিক শক্তি হিসেবে, আর তার ফলে সামাজিক ক্ষমতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার আদলে নিজের থেকে আলাদা করবে না।"

রচনাটির অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বিতীয় অংশে একই ধরনের বিবেচনা প্রয়োগ করেছেন টাকার ক্ষেত্রে। মার্কস লিখেছেন: "টাকা থেকে মুক্তি... হবে আমাদের কালের আত্মমুক্তি।" হালকাভাবে পাঠ করলে টাকার বিরুদ্ধে এই আক্রমণকে "বাস্তব, দুনিয়াবি" ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রচারণা বলে মনে হতে পারে। মার্কস লিখছেন:

> 'টাকা এখন বিশ্বশক্তি হয়ে গেছে, আর ব্যবহারিক ইহুদির মরম হয়ে গেছে

খ্রিষ্টান জনগণের ব্যবহারিক মরম। খ্রিষ্টানরা যতটুকু ইহুদি হয়েছে ইহুদিরাও ততটুকু নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।"

এরপরেই টমাস হ্যামিলটনের রচনা হতে উত্তর আমেরিকার ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানদের টাকা কামাই করবার উন্মত্ত চেষ্টার বর্ণনা আছে। এই অংশটুকু পাঠ করলে বোঝা যায় মার্কসের আক্রমণ ইহুদি জনগণের প্রতি নয় বরং টাকার নেশায় ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের প্রতি। এই ইহুদিয়ানা স্বভাবের নিরাময় খ্রিষ্টান বা নাস্তিক হওয়াতে হবে না। এর জন্য চাই টাকাহীন সমাজ যেখানে 'টাকা বানানো ইহুদি স্বভাব' কোনো কাজে আসবে না।

০৫.

মার্কস ইহুদি প্রশ্ন নিয়ে বলতে গিয়ে ইহজাগতিক উদার রাষ্ট্রের করণীয়র প্যাঁচে নিজেকে আটকে ফেলেননি। সমস্যাটা তাঁর কাছে কোনো আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমস্যা ছিল না। তা হলে ব্যাপারটা একেকজন আলাদা ইহুদির সিভিল সমাজে অধিকারের মরতবা নিয়ে নেবে। তখন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মানুষের মুক্তির পুরোনো ঝামেলার ফেরে পড়তে হবে। এখানে প্রতিটি স্বাধীনতাই অন্যসব রকমের স্বাধীনতা হতে বিচ্ছিন্ন। আপনি ব্যবসার স্বাধীনতা পাবেন, তখন মজুরের স্বাধীনতা বলতে থাকবে না খেয়ে মরবার স্বাধীনতা। আপনার নিজের সম্পত্তি থাকবে তবে তার জন্য প্রতি মুহূর্তে অন্যের সম্পত্তির অধিকারকে আপনার বুড়ো আঙুল দেখাতে হবে।

মার্কস খোদ প্রশ্নটাকেই প্রশ্ন করলেন। কোনো ইহজাগতিক ধাঁচের রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিলেই কি ইহুদি প্রশ্নের সমাধান হবে? এমন কোনো রাষ্ট্র বানিয়ে ফেললেও ধর্মীয় পরিচয়, ধর্মীয় ঠোকাঠুকি কি এই খোদগরজি সমাজে সুরাহা হবে, না কি আরো প্রকট হবে? মার্কস অতএব, একটা সামাজিক সমস্যাকে নিখাদ ধর্মীয় পরিচয়ের সমস্যা হিসেবে দেখার বিপদ নিয়ে আমাদের সাবধান করেন। একই সাথে তিনি উদার সব রকমের অধিকার মানে এক্ষেত্রে ইহুদিদের অধিকারের ধারণা নিয়ে প্রশ্ন করছেন। এখানে উদার অধিকারের ধারণা অন্যরকম ভেক ধরে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকে নিতান্ত আলাদা মানুষের টুকরো টুকরো অধিকারে বদলে দেয়।

সমাধান তাহলে লুকিয়ে আছে সমাজ রূপান্তরের মাঝে। ইহজাগতিক

উদার রাষ্ট্রের গোলক ধাঁধাঁর রাজনীতি থেকে বের হতে না পারলে এ সত্য বোঝা যাবে না। এখানে বড় একটা শিক্ষা নেয়ার আছে। কোনো দীর্ঘস্থায়ী ঘটনায় যারা নিজেরাই উপাদান তারা এর অংশ হিসেবেই এক ফেরে পড়ে যায়। ঐ ঘটনার বহাল তবিয়তের ধরন-ধারণ তখন বড় জটিল মনে হয়, এর থেকে যাওয়াটাই তার চরিত্র নির্ধারণে সমস্যা করে। ফলে একে স্বতন্ত্র, একক বিষয় বলে মনে হয়। মনে হয় সে যেন নিজেই চলে ফেরে, তার চরিত্রের গড়ন যেন সে নিজেই ঠিক করে। মার্কসের কাছ থেকে শিক্ষা নিলে এই প্যাঁচ-পয়জার থেকে বের হওয়ার সাহস পাওয়া যাবে। সাহস, কারণ তখন সমস্যা তার শুধু নিজে নিজের ভেতর থাকে না। বের হয়ে আসে। তখন দেখা যায়, যারা এক কালে আলখাল্লা পরে আমজনতাকে ভালো-মন্দের নসিহত করতো তারাই এখন গলায় টাই পরে বহুজাতিকের এক্সিকিউটিভ হয়ে সেই কাজ করছে।

এই সাহস শুধু তত্ত্বের দুনিয়াতে পয়দা করলেই হবে না। দেখবেন, আগেও যারা এখানে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসকে টেনে এনেছেন তারাও ধর্মকে একক বিষয় হিসেবে দেখে তার একতরফা ডিসকোর্সে সীমাবদ্ধ থেকে গেছেন। ফলে বিষয়টাকে মোকাবিলা করতে গেলে এর এখন পর্যন্ত তৈরি করা ইতিহাসকেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে। এই মোকাবিলা তত্ত্বে ও প্রয়োগে সমানভাবে চালাতে হবে। তখন দরকার হবে ঐতিহাসিক ঘটনা অনাবৃত করবার কাজে নিজেরাই অংশ হওয়া, ইতিহাস খোঁজা, ইতিহাস লেখা—যাতে প্রশ্নটাকেই প্রশ্ন করা যায়। ধর্মকে তাত্ত্বিকভাবে বুঝে নেয়ার কাজটা হতে হবে একে আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে দাঁড় করাবার প্রকল্পের বিরুদ্ধে রণকৌশলের অংশ। তবে মনে রাখতে হবে আমাদের কাজের ভিত্তি ও তাত্ত্বিক বুঝ-সমঝের জমিন।

০৬.

মানুষকে মুক্ত না করে রাজনৈতিক মুক্তির দৌড় কতদূর হতে পারে মার্কস বোধ হয় 'ইহুদি প্রশ্নে' তার সবচাইতে দুর্দান্ত খতিয়ান দিয়েছেন। হাল আমলের রাষ্ট্রকে উদার, জনকল্যাণমুখী করবার যে তদবির শোনা যায় তার শক্তিশালী পর্যালোচনা একটু নজর করলে মার্কসের একদম তরুণ বয়সের এই রচনায় পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক কার্যকলাপের একেবারে গোড়ার গলদগুলো কাটাছেঁড়া করে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগুলো রপ্ত করলে তা কাজে দেবে।

১৮৪৩ সালেই এই লেখার ভাবনাগুলো তাঁর কাল তো বটেই এমনকি আমাদের কালের থেকেও এগিয়ে থাকা। বর্তমানকে নিয়ে ভাবনা মানে এখনই আজকের সময়টাকে তার ইতিহাসসহ ধরতে শেখা। মার্কস তা বুঝতেন।

মার্কসের মতে, আধুনিক রাজনৈতিক মুক্তি একই কালে "পুরাতন সমাজের মৃত্যু, যে সমাজে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে সার্বভৌমদের ক্ষমতা, রাজনৈতিক পদ্ধতি আশ্রয় করে থাকে। রাজনৈতিক বিপ্লব হলো সিভিল সমাজের বিপ্লব।" রাজা-বাদশা, জমিদারদের আমলের সরাসরি রাজনৈতিক চরিত্র ছিল। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন উপাদান, যেমন সম্পত্তি, পরিবার, রুজি-রোজগারের ধরন জমিদারি, তালুক-মুলুকের আঙ্গিক গ্রহণ করে চলতো। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এগুলোই হলো সমাজের উপাদান। এই রূপেই উপাদানগুলো সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এই সম্পর্ক মানে রাজনৈতিক সম্পর্ক, সমাজের অন্যসব উপাদান হতে ব্যক্তির আলাদা হয়ে যাওয়া তার বাইরে থাকার সম্পর্ক। পুঁজিতান্ত্রিক জমানার আগে জীবনযাপনের গঠন সম্পত্তি বা শ্রমকে সমাজ উপাদানের স্তরে রাখতে পারত না। তখন মানুষ সমাজের ভেতরেই সমাজ গড়ে তুলত। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো "সমাজ" শব্দটি সক্রিয় রাষ্ট্র বহির্ভূত সামাজিক প্রশাসনের কাজ করে।

এই অবস্থায় ব্যক্তি সামগ্রিক অর্থে রাষ্ট্রতে কোনো ভূমিকা রাখত না। জমিদারির সঙ্গে ব্যক্তির জমিদারির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক মোটা দাগে জনগণের জীবনের সাথে সমাজ রাজনীতির সম্পর্ক। অপরদিকে জনগণের নির্দিষ্ট কিছু নাগরিক ক্রিয়া আর তার সাথে সম্পৃক্ত পরিস্থিতি তার সাধারণ ক্রিয়া আর পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হতো। এরকম রাষ্ট্র-সামাজিক সংগঠনের ফলে রাষ্ট্রের চৈতন্য, তার কাজ-কর্ম আর অভিপ্রায়ের যোগফল, তার সার্বিক রাজনৈতিক ক্ষমতাকে মনে হয় শাসক আর তার চাকর-বাকরের এখতিয়ার। জনগণের সাথে তার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হতো না।

এই পর্যায়ে সমাজ জীবনের সংগঠন কেমন? প্রতিটি ব্যক্তিই কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত যা তাকে অন্য দলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তার মানে সামাজিকভাবে অধিকারবোধ বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত রূপে থাকা। মানুষ কোনো না কোনো জমিদারির অন্তর্গত, তার চলাচল সীমিত, সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই টুকরো দল মিলেই বৃহত্তর অর্থে সমাজ গঠনকারী, তাদের মাঝের সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা, খণ্ডরূপগুলো দূরত্ব বাড়িয়েই দিত। সমাজ জীবন এই স্তরে সমাজ-রাষ্ট্রের

দিকে অবস্থা প্রতিকারের জন্য ঘুরে দাঁড়াতে পারে না, সমাজ বরং নিজেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়ে, ব্যক্তির সক্রিয় সত্ত্বাকে রাষ্ট্রের বাইরে রাখতে সমাজের ভেতরের ভাগগুলোকে আরো স্পষ্ট করে।

রাজনৈতিক বিপ্লবের মাঝ দিয়ে তৈরি রাজনৈতিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদি সমস্ত জনগণের এখতিয়ারে এসে পড়ে। জমিদারি, গ্রাম সমাজের বিচ্ছিন্নতা অকেজো হয়ে যায়। এগুলোই সম্প্রদায় হতে জনগণের বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করতো। এমনি করে রাজনৈতিক বিপ্লব বহাল রাজনৈতিক সম্পর্ক বিলোপ করে। সমাজ তার সবচাইতে সরল উপাদানে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে থাকে ব্যক্তি অপরদিকে ঐ ব্যক্তির জীবন গঠনকারী উপাদান, থাকে তার প্রয়োজন, ব্যক্তিক, মর্মগত, নাগরিক অধিকার।

মার্কস এখানে বলছেন যে, আত্মপরায়ণ সমাজের রাজনৈতিক চরিত্র বিলোপ করলে সামাজিক সম্পর্কের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা, খণ্ডিত চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে। ফলে ব্যক্তিরা একই রাজনৈতিক জায়গায় সহাবস্থান করে, রাষ্ট্রীয় জীবনেও অংশগ্রহণ করে। এখানে রাষ্ট্রের কাজ-কর্ম আর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না। কিন্তু সমাজের খণ্ডিতভাবে মুক্ত হওয়া উপাদানগুলো, মানে ব্যক্তির ক্রিয়া যা জীবনের বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য শর্ত বিচ্ছিন্ন হয়েই চলতে থাকে। এগুলো আর জনগণের সার্বিক অবধানের বিষয় হয়ে উঠে না। সামগ্রিক হয়ে ওঠে ব্যক্তি সর্বস্বতার মামলা, বিশেষের স্বার্থই সেখানে সামগ্রিককে বুড়ো আঙুল দেখায়। মার্কসের মতে, আগের জমানায় নাগরিক আর সমাজ জীবনের রাজনৈতিক টানাপোড়ন বিশেষ আর সার্বিকের অপূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক হয়ে পুনর্জন্ম নেয়। রাষ্ট্রের বিষয় প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির বিষয় হয়ে ওঠে তা ঠিক, তবে জনগণের বিশেষ কাজ-কর্ম আর পরিস্থিতি কোনো সার্বিক রাজনৈতিক পর্যায়ে পৌছতে পারে না। মানবিক যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য, মিলেমিশে ভাগ করবার মতো সামাজিকতা এখনো দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়নি। রাজনৈতিক বিপ্লবে সমাজ আর রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের একটা আদর্শিক সমাধান পাওয়া যায়, কিন্তু তা বাস্তব নয়। মার্কস এরপর আরো কৌতূহল উদ্দীপক আলোচনা শুরু করেন। রাষ্ট্রের ভাববাদের পালিশ যত নিখুঁত হয় তা একই সাথে আত্মপরায়ণ সমাজের বস্তুবাদকেও নিখুঁত করে। আগের জমানার রাজনৈতিক জোয়ালটা ছুঁড়ে ফেলা মানে, আত্মস্বার্থপরায়ণ সমাজের মরমকে আটকে রাখা বন্ধনগুলোকেও মুক্ত করে

ফেলা। রাজনৈতিক মুক্তি মানে একই সাথে আত্মপরায়ণ সমাজ-রাজনীতি হতে মুক্ত হয়ে যাওয়া। এর মাঝে ব্যক্তির সার্বিকতাকে ধারণ করবার নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। তালুক-মুলুকে আটকা পড়া মানুষ ছিল বিগত সমাজের ভিত্তি। সেই সমাজ তার ভিত্তিতেই মিলিয়ে যায়। মানুষ স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা টুকরো সত্ত্বা হয়ে সমগ্র সমাজকে ধারণ করে কিন্তু কোনো সামগ্রিক অস্তিত্ব গঠন করতে পারে না। জমিদারির সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক যেমন কিছু বিশেষ সুবিধা দিয়ে নির্ধারিত হতো বর্তমান সমাজে ঠিক তেমনি ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক আইনি বাধ্যবাধকতা দিয়ে নির্ধারিত। এই সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ অনিবার্যভাবে অরাজনৈতিক জীব।

নিজের তৈরি রাষ্ট্র বা সামাজিক সম্পর্কে সক্রিয় থেকেই মানুষ সমগ্রের সাপেক্ষে নিজেকে জানে। এ কারণে হাল-আমলের সমস্ত মানবিক অধিকারকে মনে প্রাকৃতিক হয়, অরাজনৈতিক। আত্মপরায়ণ মানুষ বিগত সমাজের পরোক্ষ উৎপাদন। রাজনৈতিক বিপ্লব সমাজ গঠনকারী একক ব্যক্তির মাঝে সমগ্র সমাজকে মিলিয়ে দেয়। তাদের বহাল অবস্থাকে আর কোনো পর্যালোচনা করে না। রাজনৈতিক মানে বুর্জোয়া বিপ্লবের চৈতন্যে এটাই শেষ কথা। তখন এক প্রান্তে দাঁড়ায় প্রতিনিয়তকার প্রয়োজনের সাথে যুঝতে থাকা, বাস্তব মানুষ; অন্য প্রান্তে নৈতিক, উপমা দেয়ার মতো, হাওয়াই, কৃত্রিম রাজনৈতিক মানুষ। বাস্তব মানুষের স্বীকৃতি এই সমাজ আত্মপরায়ণ, ধান্দাবাজ ব্যক্তিকেই দেয়, রাষ্ট্রের মাঝে যে ব্যক্তি এক হাওয়াই নাগরিকের বেশি কিছু নয়। ব্যক্তি মানুষ নিজের মাঝেই কয়েদ হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিপ্লব রাষ্ট্রের বহাল, অনড় অবস্থার মতোই সমান রকম বাস্তব রূপ নেয়। রাষ্ট্রের রাহসিক, অধিবিদ্যক রূপের মতো রূপ লাভ করে ব্যক্তি মানুষ। তার সংস্কৃতি, শিল্পের একই কানাগলিতে ঘুরে মরা নজরে পড়ে। রাজনৈতিক সার্বিকতায় আপাদমস্তক বদলে যাওয়ার বদলে সে তা বর্জন করে বসে।

আধুনিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র ব্যক্তির প্রত্যক্ষ, তাৎক্ষণিক স্বার্থই চূড়ান্ত বাস্তবতা। এই শর্ত ধরেই অপর ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক, পরিচয় নির্ধারিত হয়, যাকে জায়েজ করে রাষ্ট্রের আইন, প্রতিষ্ঠান। মানুষ বেঁচে থাকে বিগত যুগের জীবন্ত স্মৃতি চিহ্ন হয়ে।

আধুনিক রাষ্ট্র আত্মপরায়ণ সমাজের মানুষকে যেমন আছে তেমনভাবেই

অপরোক্ষ রূপে বাস্তব আর স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। ব্যক্তির সামগ্রিকতায় বাস্তব অস্তিত্বের বিপরীতে নাগরিকের হাওয়াই, অবাস্তব রাজনৈতিক জীবনই হয়ে ওঠে বাস্তব জীবন। তার ফলে রাষ্ট্র অবাস্তব, হাওয়াই রূপের নাগরিক জীবনকেই স্বীকৃতি দেয়, তাকেই রক্ষা করে। সমাজের আপাত স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে বুঝতে হলে রাজনৈতিক মুক্তির ভিত্তি হিসেবে, রাজনৈতিক বিপ্লবের ভিত হিসেবে আত্মপরায়ণ সমাজের ব্যক্তিকে এমনি করেও বুঝতে হবে।

রাজনৈতিক দর্শনের জমিনে এই বিশ্লেষণ কার্ল মার্কসের খুব বড় অবদান।

"রাজনৈতিক জীবন নিজেকে নিছক এক উপায় বলে ঘোষণা করে, যার লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মপরায়ণ সমাজের জীবন। বিপ্লবী চর্চা যে নিজের তত্ত্বের সঙ্গে মারাত্মক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ এ কথা সত্য মুক্তির অধিকার যখনই রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামে তখনই তা আর অধিকার থাকে না। অথচ তত্ত্বে কিন্তু রাজনৈতিক জীবন সোজাসাপ্টা কথায় স্বতন্ত্র মানুষের নিশ্চয়তা বিধান করে। আর তা যদি তার লক্ষ্যের সাথে, মানে মানুষের এইসব অধিকারের দ্বন্দ্ব করে তাহলে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু চর্চা তো কেবল ব্যতিক্রম আর তত্ত্বই নিয়ম!"

০৭.

রাজনৈতিক রাষ্ট্র মানুষের বস্তুগত জীবনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে। এর একদিকে আত্মপরায়ণ জীবন দাপটের সাথে টিকে থাকে রাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাইরে সমাজের ভেতরে। সবাই একে সমাজেরই বৈশিষ্ট্য বলে তার মতো করে চলতে বাধ্য হয়। এই ঠুঁটো রাষ্ট্র যত নিখুঁত হয় ততই মানুষের সমাজ জীবনে তার প্রভাব কমতে থাকে। কারণ মানুষের সাথে তার সম্পর্ক কেবল কিছু ফৌজদারি সম্পর্কে পর্যবসিত হয়। তার মাঝে মানুষ চিন্তায়, চৈতন্যে, বাস্তবে দু'মুখো জীবন যাপন করে। একদিকে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের জীবন যেখানে সে নিজেকে দেখে এক সম্প্রদায়গত সত্ত্বা হিসেবে। অপরদিকে আত্মপরায়ণ সমাজ জীবন, যেখানে সে একাকী, যেখানে প্রতিটি অপর মানুষই তার ধান্দা হাসিলের হাতিয়ার, তার স্বার্থের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী। তৃতীয় এই মাধ্যমের মাঝ দিয়ে মানুষকে দেখতে গিয়ে, চিনতে গিয়ে সে এক বিজাতীয় ক্ষমতার দাস হয়ে পড়ে। জীবে জীবে পর্দা হয়ে সে একা হয়ে পড়ে। জগত হয়ে পড়ে অবোধ্য, রহস্যময়। আগের কালের ধর্মীয়

রহস্যবাদ আজকে এমনি করে রূপ নিয়েছে সর্বময় কিন্তু যেন অবোধ্য বাজারের ক্ষমতায়।

একদিকে বাজার সমাজ আর অপরদিকে রাজনৈতিক রাষ্ট্র। এই দুইয়ের মাঝের সম্পর্ক ঠিক যেন পরকাল আর ইহকালের সম্পর্কের মতোই মরমী। জাগতিক বাসনা, অতৃপ্ততা, কখনো ক্ষোভকে ধর্ম যেমন ধারণ করে, বাস্তবকে অমূর্ত করে, রাজনৈতিক রাষ্ট্রও তেমন ধান্দাবাজির সমাজ, অতৃপ্ততা, অসাম্যকে ধারণ করে বাস্তব সমস্যাগুলোর হাওয়াই রূপ দিয়ে। সেখানে আইনের চোখে সবাই সমান, যার কোনো বাস্তব প্রয়োগ তার বহাল অসাম্য বজায় রেখে অসম্ভব। সমাজের ভেতর তার ব্যক্তিসত্ত্বা তাকে আত্মপরায়ণতার কাছে বলি দিয়ে নিঃসঙ্গ করে। আর রাষ্ট্রে তার সমন্বিত সত্ত্বা স্বীকৃত, কিন্তু এই সমন্বয় পুরোটাই কাল্পনিক, তার বাস্তব, ব্যক্তি জীবনের সাথে যোগহীন। এই রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় বলয়ের কল্পজীবন বাস্তবেরই মরমী প্রকাশ। অর্থাৎ ধর্মের মূল প্রকল্পের সাথে তার কোনো গঠনগত তফাত নেই।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক রাষ্ট্র নিজেকে যত ইহজাগতিক করে ততই সে মর্মগতভাবে নিখাদ ধর্মেরই ভূমিকা পালন করতে নেমে পড়ে।

রাষ্ট্র নিজেকে ব্যবসা হতে আলাদা করে ফেলেছে। তার ফলে ব্যবসা অস্বীকৃত হয়নি বরং রাষ্ট্রের ওপরই খবরদারি করছে। এভাবেই ধর্মের উপরিকাঠামোগত উপাদান নিজেই ধারণ করে রাষ্ট্রকে ইহজাগতিক ঘোষণা করলে ধর্ম অস্বীকৃত হয়ে যায় না। এতে তার মাঝের ঐতিহাসিক, উপরিকাঠামোগত অসমাধিত প্রশ্নগুলো রাষ্ট্রের ওপরই চেপে বসে। বাংলাদেশে তথাকথিত মৌলবাদের কান ফাটানো আওয়াজ আর রাষ্ট্রের মডারেট মুসলিম হওয়ার দাবি এ কথাই তো বলছে।

জাভেদ হুসেন
ঢাকা, ২০০৯

ইহুদি প্রশ্নে

কার্ল মার্কস

1. Bruno Bauer, Die Judenfrage, Brunschweig, 1843
2. Bruno Bauer, 'Die Fahigkeit Der Heutigen Juden and Christen, Frei Zu Werden' Einundzwanzig Bogen aus der schweiz, Published by George Herwegh. Zurich and Winttrthur, 1843, pp 56-57

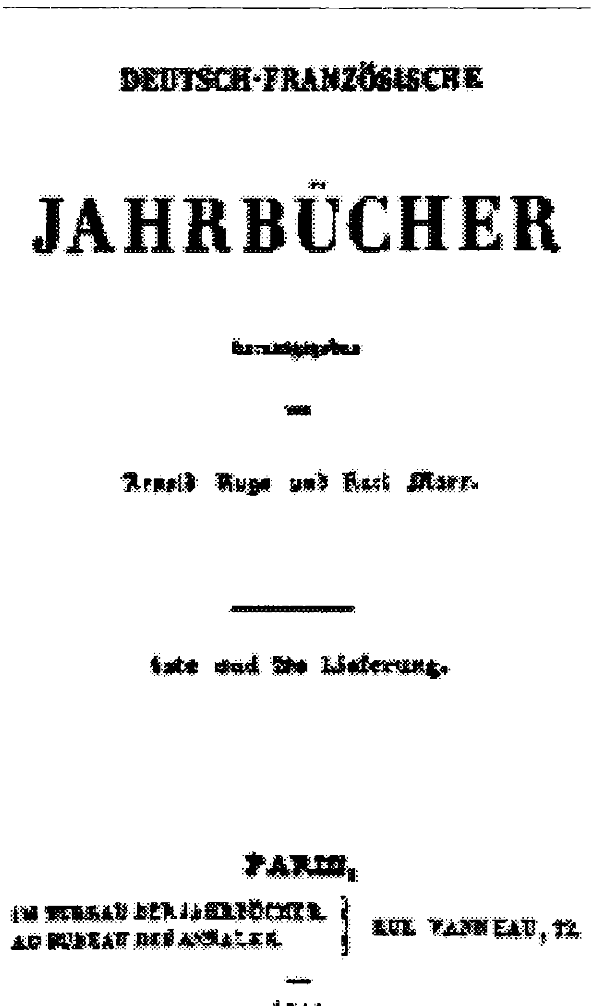

DEUTSCH-FRANZÖSISCHE

JAHRBÜCHER

herausgegeben

von

Arnold Ruge und Karl Marx.

1ste und 2te Lieferung.

PARIS,

IM BUREAU DER JAHRBÜCHER, AU BUREAU DES ANNALES, RUE VANNEAU, 22.

1844.

জর্মন-ফরাসি বর্ষপঞ্জির প্রচ্ছদ

১

ব্রুনো বাউয়ের, ইহুদি প্রশ্ন
ব্রনশভিগ, ১৮৪৩

জর্মন ইহুদিরা মুক্তি চায়। কি রকম মুক্তি তাদের বাসনা? *নাগরিক*, *রাজনৈতিক* মুক্তি।

ব্রুনো বাউয়ের তাদের জবাব দিলেন: জর্মন দেশে কেউই রাজনৈতিকভাবে মুক্ত নয়। আমরা নিজেরাই স্বাধীন নই। আমরা কেমন করে তোমাদের স্বাধীন করবো? ইহুদি হিসেবে তোমরা যদি নিজেদের জন্য কোনো বিশেষ রকমের মুক্তি চাও তবে বলতে হয় যে, তোমরা ইহুদিরা *খোদ্‌গরজি*। জর্মন হিসেবে তোমাদের উচিত জর্মন দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করা। মানুষ হিসেবে উচিত মানবজাতির মুক্তির জন্য কাজ করা। তোমাদের যে বিশেষ রকমের নির্যাতন আর অবমাননা ভোগ করতে হয় তাকে বহাল নিয়মের ব্যতিক্রম নয় বরং তার প্রমাণ হিসেবেই অনুভব করা উচিত।

না কি ইহুদিরা *খ্রিষ্টান প্রজাদের* সমান মর্যাদা চায়? সে ক্ষেত্রে তারা মেনে নেয় যে, এই খ্রিষ্টান রাষ্ট্র বৈধ, তার সাধারণ নির্যাতনও বৈধ। যদি সাধারণের জোয়ালই মেনে নেয়া গেল তবে বিশেষ জোয়ালটাতে আপত্তি কেন? জর্মনরা কেন ইহুদিদের মুক্তিতে মাথা ঘামাবে যদি ইহুদিরা জর্মনদের মুক্তি নিয়ে মাথা না ঘামায়?

এই *খ্রিষ্টান* রাষ্ট্র শুধু বিশেষ *সুবিধা* বোঝে। এই রাষ্ট্রে ইহুদিদের ইহুদি হয়ে থাকার বিশেষ সুবিধা আছে। ইহুদি হিসেবে তার এমন সব অধিকার আছে, যা খ্রিষ্টানদের নেই। যা তার নেই, খ্রিষ্টানদের আছে, এমন অধিকার সে কেন চাইবে?

খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের কাছে মুক্তি চেয়ে, ইহুদিরা দাবি করছে যে, এই খ্রিষ্টান

রাষ্ট্র যেন তার *ধর্মীয়* পক্ষপাত ত্যাগ করে। এই ইহুদি কি *নিজের* ধর্মীয় পক্ষপাত ত্যাগ করেছে? তবে কি তার অন্য কাউকে নিজ ধর্ম অস্বীকার করতে বলার অধিকার থাকে?

এই খ্রিষ্টান রাষ্ট্র তার একেবারে *স্বভাবেই* ইহুদিদের মুক্ত করতে অক্ষম; তবে তার সাথে বাউয়ের যোগ করে দেন যে, একেবারে তার নিজের স্বভাবের কারণেই ইহুদিরা মুক্ত হতে পারে না। যতক্ষণ রাষ্ট্রের খ্রিষ্টানপনা আর ইহুদিদের ইহুদিয়ানা আছে, ততক্ষণ এক পক্ষ পারবে না মুক্তি দিতে অপর পক্ষ পারবে না মুক্তি গ্রহণ করতে।

এই খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ইহুদিদের প্রতি খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের বাঁধা পথেই আচরণ করতে পারে। তার মানে বিশেষ সুবিধা দেয়া, অন্য প্রজাদের কাছ হতে ইহুদিদের বিচ্ছিন্নতা অনুমোদন করা। কিন্তু তা করা হবে তাকে সমাজের অন্য সব বিচ্ছিন্ন বলয়ের চাপ অনুভব করিয়ে এবং সেই অনুভব সবচেয়ে নিরেট, কারণ সে দাপুটে ধর্মের ধর্মীয় বিরোধিতায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু ইহুদিদেরও রাষ্ট্রের প্রতি আচরণ থাকতে পারে ষোলআনা ইহুদিয়ানা ধরনে—মানে, রাষ্ট্রকে তার কাছে বিজাতীয় কিছু একটা হিসেবে দেখা, তার কাল্পনিক জাতীয়তাকে বাস্তব জাতীয়তার, বিভ্রমাত্মক আইনকে বাস্তব আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো, নিজেকে মানবজাতি হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটাকে বৈধ মনে করা, ঐতিহাসিক আন্দোলনে অংশ নেয়া হতে নীতিগতভাবে দূরে থাকা, এমন এক ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন করা, যার সাথে মানবজাতির সাধারণ ভবিষ্যতের কোনো মিল নেই আর নিজেকে ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ও ইহুদি সম্প্রদায়কে নির্বাচিত সম্প্রদায় হিসেবে দেখা।

তাহলে, কোন ভিত্তিতে তোমরা ইহুদিরা মুক্তি চাও? তোমাদের ধর্মের খতিয়ানে? সে তো রাষ্ট্রধর্মের জানের দুশমন। নাগরিক হিসেবে? জর্মন দেশে নাগরিক বলতে কিছু নেই। মানুষ হিসেবে? কিন্তু যাদের কাছে আর্জি জানাচ্ছো তোমরা তো তাদের মতোই মানুষ।

ইহুদি মুক্তির প্রশ্নটিকে বাউয়ের নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, এই প্রশ্নের বিগত সূত্রায়ন এবং সমাধানের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করে। তিনি সওয়াল করছেন, যাকে মুক্ত করতে হবে সেই ইহুদি আর তাকে মুক্ত করবে যে খ্রিষ্টান রাষ্ট্র—তাদের *স্বভাব* কি? জওয়াবটা তিনি দিচ্ছেন ইহুদি

ধর্মের পর্যালোচনার মাধ্যমে, ইহুদি আর খ্রিষ্টান *ধর্মের* মাঝের *ধর্মীয়* বিরোধিতা বিশ্লেষণ করে, খ্রিষ্টান রাষ্ট্রটির সারসত্ত্বা পরিষ্কার করে দেখিয়ে। আর এসব তিনি করেছেন সাহসের সাথে, মোক্ষম যুক্তি দিয়ে, বাক্য বৈদগ্ধ আর গভীরতার সাথে, লেখার ঢঙ যেমন বাহুল্যবর্জিত তেমন শক্তিশালী আর অর্থপূর্ণ।

তাহলে, বাউয়ের কেমন করে ইহুদি প্রশ্নের সমাধান করেন? ফলাফলটা কী দাঁড়ায়? যে কোনো প্রশ্নের সূত্রায়নই হচ্ছে তার সমাধান। ইহুদি প্রশ্নের পর্যালোচনাই ইহুদি প্রশ্নের উত্তর। অতএব, সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

অন্যদের মুক্ত করবার আগে অবশ্যই আমাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

খ্রিষ্টান আর ইহুদিদের মধ্যে বিরোধিতার সবচেয়ে অনড় আঙ্গিক হচ্ছে *ধর্মীয়* বিরোধিতা। কোনো বিরোধিতা কেমন করে সুরাহা করা যায়? তাকে অসম্ভব করে তুলে। ধর্মীয় বিরোধিতা কেমন করে অসম্ভব করে তোলা যায়? *ধর্ম রদ* করে দিয়ে। যখনই ইহুদি আর খ্রিষ্টান চিনে ফেলবে যে তাদের নিজেদের ধর্ম *মানব মনের বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ, ইতিহাসের* পরিত্যাগ করা ভিন্ন ভিন্ন সাপের খোলস ছাড়া কিছু নয়, আর সেই সাপ হচ্ছে মানুষ— তখন ইহুদি আর খ্রিষ্টানের সম্পর্ক আর ধর্মীয় না থেকে কেবল *পর্যালোচনামূলক,* বৈজ্ঞানিক ও মানব সম্পর্ক হয়ে যায়। বিজ্ঞান তখন তাদের ঐক্য গঠন করে। তবে, বিজ্ঞানের মাঝের দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের নিজের দ্বারাই মীমাংসিত হয়।

জর্মন ইহুদিরা বিশেষ করে রাজনৈতিক মুক্তির সাধারণ অনুপস্থিতি আর রাষ্ট্রের খুব জোরদার ছাপ মারা খ্রিষ্টান চরিত্রের মোকাবিলা করেন। যাহোক, বাউয়ের-এর ধারণা মতে, ইহুদি প্রশ্নের একটি সার্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা কিনা বিশেষ রকম জর্মন অবস্থা হতে স্বাধীন। এ হলো রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্কের, *ধর্মীয় পক্ষপাত আর রাজনৈতিক মুক্তির মাঝের দ্বন্দ্বের* প্রশ্ন। ইহুদি আর রাষ্ট্র উভয়ের কাছে, ধর্ম হতে মুক্তিকে রাখা হয়েছে এক শর্ত হিসেবে যেখানে একপক্ষ রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হতে চায়, আরেক পক্ষ সেই মুক্তিকে কার্যকর করবে আর নিজেও মুক্ত হবে।

"বেশ', এ কথা বলা হয়, আর তা ইহুদিরাই বলে, 'ইহুদিরা মুক্ত হয়ে

উঠবে ইহুদি হিসেবে নয়, ইহুদি বলে নয়, তার এমন চমৎকার, সার্বিকভাবে মানবিক নৈতিকতার নীতি আছে বলে নয় বরং *ইহুদিরা* পশ্চাৎপসরণ করবে *নাগরিকতার* আড়ালে। আর নিজে *নাগরিক* হবে, যদিও সে একজন ইহুদি এবং তাকে ইহুদিই থাকতে হবে। বলতে গেলে সে ইহুদি আছে ইহুদি থাকবে, যদিও সে একজন *নাগরিক* আর বাস করে *সার্বিকভাবে* মানব শর্তে, তাই তার ইহুদিয়ানা আর বাঁধাধরা স্বভাব সবসময়ই শেষে তার মানবিক আর রাজনৈতিক দায়ের ওপরে থাকে। সাধারণ নীতিগুলো দমিয়ে রাখলেও পক্ষপাত থেকে যায়। আর যদি থেকে যায়, তবে তা বাকি সবকিছুকে ছাপিয়েও যায়। 'কেবল পরিশীলিতভাবে, বাহ্যিকভাবে *রাষ্ট্রজীবনে* ইহুদিরা ইহুদি থাকতে পারবে। তাই, সে যদি ইহুদিই থেকে যেতে চায় তবে নিছক বাহ্যিকতাই সার হয়ে চড়াও হবে। মানে তার রাষ্ট্রজীবন সার এবং নিয়মের নিছক সদৃশ বা তার অস্থায়ী ব্যতিক্রম হবে।" ("The capacity of present day Jews and Christians to become free." Einundzwanzig Bogen, PP 57)

অপরদিকে, বাউয়ের রাষ্ট্রের কাজটিকে কেমন করে উপস্থাপন করেন তা শোনা যাক।

তিনি বলেন:

'ইদানীংকালে ফ্রান্স আমাদের (ডেপুটিদের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী, ডিসেম্বর ২৬, ১৮৪০) ধারাবাহিকভাবে অন্যসব *রাজনৈতিক* প্রশ্নের মতো ইহুদি সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নেও এক মুক্তজীবনের ছবি দেখিয়েছে। তা মুক্ত কিন্তু এর স্বাধীনতা আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, তাই তাকে এক প্রতিভাস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর অপরদিকে তা এর ক্রিয়া দ্বারা এর স্বাধীন আইনের সাথে দ্বন্দ্ব করছে।

"ফ্রান্সে সার্বিক মুক্তি এখনো আইন হয়নি, *ইহুদি প্রশ্নটিরও* এখনো সমাধান হয়নি। কারণ আইনগত স্বাধীনতা, সব নাগরিক যে সমান—তা বাস্তব জীবনে সীমাবদ্ধ। এই আইনগত স্বাধীনতা এখনো ধর্মীয় বিশেষ সুবিধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও খণ্ডিত। বাস্তব জীবনে স্বাধীনতার এই ঘাটতি আইনের ওপর প্রভাব ফেলে তাকে এমনিতে স্বাধীন নাগরিকদের নির্যাতনকারী আর নির্যাতনভোগী ভাগে বিভক্তি অনুমোদন করে।" (পৃষ্ঠা-৬৫)

তাহলে ফ্রান্সে কোথায় ইহুদি প্রশ্ন সমাধা হবে?

"উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইহুদিরা যদি নিজেকে তার আইন দ্বারা রাষ্ট্র ও সহনাগরিকের প্রতি তার দায়িত্ব পালন হতে বিরত হতে না দেয় তবে

সে আর ইহুদি থাকবে না। যেমন স্যাবাথের দিনে ডেপুটিদের কার্যালয়ে যাওয়া, দাফতরিক কাজকর্ম করা। প্রতিটি *ধর্মীয় বিশেষ সুবিধা*, আর তাই একই সাথে বিশেষ সুবিধাভোগী চার্চের একচ্ছত্রতাও পুরোপুরি রদ করতে হবে। আর যদি কয়েকজন বা অনেকজন এমনকি ব্যাপক *সংখ্যাগুরুও তখনো ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব পূরণে নিজেদের বাধ্য বলে মনে করে, তাহলে সেটা তাদের নিখাদ ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে ছেড়ে দিতে হবে।*" (পৃষ্ঠা-৬৬)

"বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ধর্ম না থাকলে ধর্ম বলতেও কিছু থাকে না। ধর্ম হতে ধর্মচ্যুত করবার ক্ষমতাটা নিয়ে নাও, তাহলে তার আর অস্তিত্ব থাকবে না।" (পৃষ্ঠা-৭১)

ঠিক যেমন জনাব মার্টিন দু নর্দ সমস্ত আইনে রবিবারের উল্লেখ করা বাতিল করবার প্রস্তাবটিকে খ্রিষ্টানতত্ত্বের অস্তিত্বহীনতার ঘোষণা বলে দেখেছেন। তেমনি করেই, একই অধিকারে (যার ভিত্তিও বেশ শক্ত) ইহুদিদের স্যাবাথের আইন থেকে মুক্ত করবার ঘোষণা হবে ইহুদিবাদ বিলুপ্তির ঘোষণা। (পৃষ্ঠা-৭১)

বাউয়ের তাহলে একদিকে দাবি করছেন যে, *নাগরিক* মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ইহুদিকে তার ধর্ম আর সাধারণভাবে মানবজাতির ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত। অপরদিকে তিনি বেশ দৃঢ়ভাবেই ধর্মের, *রাজনৈতিকভাবে* ধর্মের রদকরণকে সামগ্রিকভাবে খোদ ধর্মেরই রদ বলে বিবেচনা করেন। যে রাষ্ট্র ধর্মকে পূর্বানুমান বলে ধরে নেয় তা এখনো সত্যিকারের বাস্তব রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি।

"ধর্মীয় ধারণা অবশ্যই রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা নিতে দিতে পারে। কিন্তু সে কোন রাষ্ট্রের? *কোন ধরনের রাষ্ট্রের?* (পৃষ্ঠা-৯৭)

এইখানে এসে ইহুদি প্রশ্নের *একতরফা* সূত্রায়ন পরিষ্কার হয়ে যায়।

কে মুক্ত করবে? কাকে মুক্ত করতে হবে?—শুধু এটুকু অনুসন্ধান করাই যথেষ্ট ছিল না। অনুসন্ধান করতে হতো যে, প্রশ্নটা *কোন ধরনের মুক্তির?* যে রকম মুক্তি দাবি করা হচ্ছে তার একেবারে নিজের স্বভাব হতে কি শর্তাদি বের হয়ে আসে? একমাত্র খোদ *রাজনৈতিক মুক্তির* সমালোচনাই হতে পারতো ইহুদি প্রশ্নের সিদ্ধান্তমূলক সমালোচনা আর 'কালের সাধারণ প্রশ্ন'তে এর বাস্তব যোগসাধন।

বাউয়ের যেহেতু এই পর্যায়ে প্রশ্নটিকে তোলেননি, তিনি দ্বন্দ্ব বিরোধের

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি এমন সব শর্ত সামনে নিয়ে আসেন, যা খোদ *রাজনৈতিক মুক্তির* স্বভাবের ভিত্তি হতে আসা নয়। তিনি এমন সব প্রশ্ন তোলেন, যা তার সমস্যার অংশ নয়, আর এমন সব সমস্যার সমাধান করেন যাতে প্রশ্নটির উত্তর আর পাওয়া যায় না। বাউয়ের যখন ইহুদি মুক্তির বিরোধীশক্তির সম্পর্কে বলেন যে: তাদের একমাত্র গলদ হচ্ছে যে তারা খ্রিষ্টান রাষ্ট্রটিকে একমাত্র সত্য রাষ্ট্র বলে মনে করেন এবং ইহুদি ধর্মকে তারা যে সমালোচনায় ফেলেন খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের বেলায় তা প্রয়োগ করেন না," (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩) তখন আমরা তার নিজের গলদটির মূলে যা দেখতে পাই তা হলো, তিনি শুধু 'খ্রিষ্টান রাষ্ট্র'টিকে সমালোচনার তোপে ফেলেন, 'রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রকে' নয়, তিনি মানবমুক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক মুক্তির সম্পর্কটি অনুসন্ধান করেন না, আর তাই এমন সব শর্তকে সামনে তুলে ধরেন, যা কেবল *সাধারণ মানবমুক্তির সাথে রাজনৈতিক মুক্তির* পর্যালোচনাহীন গুলিয়ে ফেলা হিসেবেই আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বাউয়ের যদি ইহুদিদের প্রশ্ন করেন: তোমাদের জায়গা থেকে কি তোমরা *রাজনৈতিক মুক্তি* চাওয়ার অধিকার রাখো? আমরা তাহলে পাল্টা প্রশ্ন করি: *রাজনৈতিক* মুক্তির জায়গা কি ইহুদিদের ইহুদি ধর্ম আর মানুষকে ধর্ম পরিত্যাগ করবার দাবি করার অধিকার দেয়?

ইহুদিরা যে রাষ্ট্রে বাস করে তার ওপর ভিত্তি করে ইহুদি প্রশ্নটি ভিন্ন এক রূপ পরিগ্রহ করে। জার্মানিতে যেখানে কোনো রাজনৈতিক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্ররূপে রাষ্ট্র নেই, ইহুদি প্রশ্নটি এখানে তাই একেবারেই *ধর্মতাত্ত্বিক*। খ্রিষ্টানত্বকে ভিত্তি হিসেবে নেয়া রাষ্ট্রের সামনে ইহুদিরা নিজেদের *ধর্মীয়* বিরোধিতায় দেখতে পান। এই রাষ্ট্র *ঘোষিতভাবেই* ধর্মতাত্ত্বিক। সমালোচনা এখানে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা। তার আবার দু'ধারা—ইহুদি আর খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা। তাই আমরা ধর্মতত্ত্বের বলয়েই ছুটোছুটি করতে থাকি, যতই এর ভেতরে আমরা *বিশ্লেষণাত্মক* হই না কেন।

সাংবিধানিক রাষ্ট্র ফ্রান্সে ইহুদি প্রশ্নটি সাংবিধানিকতার প্রশ্ন, রাজনৈতিক মুক্তির *অপূর্ণাঙ্গতার* প্রশ্ন। যেহেতু রাষ্ট্রধর্মের এক সদৃশ এখানে বহাল, যদিও অর্থহীন এবং স্ববিরোধী আকারে, *সংখ্যাগুরুর ধর্মে*, রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহুদিদের সম্পর্ক তাই ধর্মীয়, ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধিতার *সদৃশে* বহাল।

কেবল উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে—অন্তত তার কয়েকটাতে ইহুদি

প্রশ্ন তার *ধর্মতাত্ত্বিক* বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বাস্তবিক, *ইহজাগতিক* প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। কেবল যেখানে রাজনৈতিক রাষ্ট্র তার সর্বাঙ্গীণ পরিণত রূপে বহাল, সেখানেই ইহুদি আর সাধারণভাবে ধার্মিক মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং ফলত রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিজেকে তার বিশিষ্ট, নিখাদ চরিত্রে প্রকাশ করতে পারে। রাষ্ট্র যখনই ধর্মের প্রতি *ধর্মতাত্ত্বিক* আচরণ বন্ধ করে, যখনই সে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র হিসেবে মানে *রাজনৈতিক*ভাবে আচরণ করে তখনই এই সম্পর্কের সমালোচনা আর ধর্মতাত্ত্বিক সমালোচনা থাকে না। সমালোচনা তখন হয়ে ওঠে *রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সমালোচনা*। এইখানে এসে প্রশ্নটি যখন তার ধর্মতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, বাউয়ের-এর বিশ্লেষণও আর বিশ্লেষণাত্মক থাকে না।

"যুক্তরাষ্ট্রে কোনো রাষ্ট্রধর্ম বা সংখ্যাগুরুর ধর্ম অথবা একতন্ত্রের ওপর অন্য তন্ত্রের প্রাধান্য নেই। রাষ্ট্র সব তন্ত্র থেকে আলাদা থাকে।" (Marie ou l'esclavage aux Etats-Unis, etc., by G. de Beaumont, Paris. 1885, P-214) আদতেই উত্তর আমেরিকার এমন কিছু রাষ্ট্র আছে যেখানে "সংবিধান কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা চর্চা রাজনৈতিক অধিকারের শর্ত হিসেবে আরোপ করে না।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫) তথাপি "যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ বিশ্বাস করে না যে ধর্মহীন মানুষ সৎ হতে পারে।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪)

বিউমঁ, তকভিল আর হ্যামিলটন সাহেব আমাদের একই সুরে আশ্বস্ত করেন যে, উত্তর আমেরিকা সর্বোৎকৃষ্ট ধার্মিকতার দেশ। যাহোক উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো আমাদের জন্য কেবল উদাহরণের কাজ দেয়। প্রশ্নটা হচ্ছে: ধর্মের সঙ্গে *সম্পূর্ণ* রাজনৈতিক মুক্তির সম্পর্ক কি? আমরা যদি দেখি যে *সম্পূর্ণ* রাজনৈতিক মুক্তির দেশেও ধর্ম শুধু অস্তিত্বমান তাই নয় বরং *তাজা আর প্রাণবন্ত* সতেজতা দেখায়, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, ধর্মের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের *নিখুঁত তত্ত্বের সাথে ঠোকাঠুকি* লাগায় না। ধর্মের অস্তিত্ব যদি কোনো খুঁত হয়ে থাকে তবে, এই খুঁতের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে কেবল খোদ রাষ্ট্রের স্বভাবের ভেতর। আমরা ধর্মকে *আর কারণ* হিসেবে বিবেচনা করি না, বিবেচনা করি কেবল ইহজাগতিক সংকীর্ণতার *প্রকাশ* হিসেবে। তাই মুক্ত স্বাধীন নাগরিকের ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করি তাদের ইহজাগতিক সীমাবদ্ধতা দিয়ে। আমরা বলি না যে, এই ইহজাগতিক বাধা-নিষেধ থেকে ছাড়া পেতে তাদের অবশ্যই ধর্মীয় সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে

হবে। আমরা বলি যে, ইহজাগতিক বাধা-নিষেধ থেকে একবার ছাড়া পেলেই তারা তাদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা অতিক্রম করবে। আমরা ইহজাগতিক প্রশ্নটিকে ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নে পরিণত করি না। ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নকেই ইহজাগতিক করে তুলি। ইতিহাস কুসংস্কারে অনেক ডুবে থেকেছে। আমরা এখন কুসংস্কারকে ইতিহাসে *ডুবিয়ে দিচ্ছি*। *ধর্মের সাথে রাজনৈতিক মুক্তির* সম্পর্কের প্রশ্নটা আমাদের জন্য হয়ে যায় *রাজনৈতিক মুক্তির সাথে মানবমুক্তির সম্পর্কের* প্রশ্ন। রাজনৈতিক রাষ্ট্রের ধর্মীয় দুর্বলতাকে আমরা ধর্মের সাপেক্ষে এর দুর্বলতা থেকে *সরে* রাজনৈতিক রাষ্ট্রের ইহজাগতিক আঙ্গিকের সমালোচনা দিয়ে সমালোচনা করি। একটি বিশেষ ধর্মের সাথে (ধরা যাক ইহুদি ধর্ম) রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বকে আমরা মানব আঙ্গিক দেই, এই দ্বন্দ্বকে রাষ্ট্রের সাথে নির্দিষ্ট ইহজাগতিক উপাদানের দ্বন্দ্বে পরিণত করে; রাষ্ট্র আর সাধারণভাবে ধর্মের দ্বন্দ্বকে পরিণত করে রাষ্ট্রের সাথে এর সাধারণ পূর্বানুমানের দ্বন্দ্বে।

ইহুদি, খ্রিষ্টান আর সাধারণভাবে *ধার্মিক* মানুষের *রাজনৈতিক* মুক্তি হলো ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টান কিংবা সাধারণভাবে ধর্ম হতে *রাষ্ট্রের মুক্তি*। রাষ্ট্র হিসেবে *রাষ্ট্র* তার নিজের ধরনে, একেবারে তার চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নিজেকে ধর্ম হতে মুক্ত করে খোদ নিজেকে *রাষ্ট্রধর্ম* হতে মুক্ত করার মাধ্যমে—মানে, রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মের পক্ষে সাফাই গেয়ে নয়, বরং নিজেকে রাষ্ট্র হিসেবে জাহির করে। ধর্ম হতে *রাজনৈতিক* মুক্তি-ফয়সালা পর্যন্ত বয়ে নেয়া কোনো ধর্মীয় মুক্তি নয় আর তা বিরোধ হতেও মুক্ত নয়, কারণ রাজনৈতিক মুক্তি ফয়সলা হয়ে যাওয়া, বিরোধবিহীন অথবা দ্বন্দ্ববিহীন হতে মুক্ত *মানবমুক্তির* কোনো আঙ্গিক নয়।

রাজনৈতিক মুক্তির সীমা একটা বাস্তবতা হতে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা হলো রাষ্ট্র-মানুষকে বাস্তবিকভাবে কোনো বাধা-নিষেধ হতে মুক্ত না করেই নিজেকে তা হতে মুক্ত করতে পারে, মানুষ মুক্তমানব না হলেও রাষ্ট্র *মুক্ত রাষ্ট্র* হতে পারে। না লিখলেও বাউয়ের যে তা স্বীকার করেন সে কথা বোঝা যায় যখন তিনি রাজনৈতিক মুক্তির নিম্নোক্ত শর্ত তুলে ধরেন:

> "সমস্ত ধর্মীয় সুবিধা, আর তাই কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া বিশেষ সুবিধা একেবারে নির্মূল করতে হবে, আর যদি কিছু মানুষ বা

অনেকে এমনকি *সংখ্যাগরিষ্ঠরাও তখনো ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব পালনে নিজেদের বাধ্য বলে বিশ্বাস করে* তবে তা তাদের *নিখাদ ব্যক্তিগত* ব্যাপার হিসেবেই ছেড়ে দেয়া উচিত।" (*The Jewish Question*, P-65)

অতএব, *সংখ্যাগরিষ্ঠজন* ধার্মিক হলেও রাষ্ট্রের পক্ষে নিজেকে ধর্ম হতে মুক্ত করা সম্ভব। আর সংখ্যাগরিষ্ঠজনের *ব্যক্তিগতভাবে* ধার্মিক হওয়া থেকে বিরত থাকার বিষয়টি থাকে না।

কিন্তু সর্বোপরি, ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র আর বিশেষ করে *প্রজাতন্ত্রের* (মুক্ত রাষ্ট্র) আচরণ শেষ পর্যন্ত ধর্মের প্রতি মানুষেরই আচরণ, যে মানুষ রাষ্ট্র গঠন করে। এ থেকে পাওয়া গেল যে, মানুষ *রাষ্ট্রের মাধ্যমিকতার* মধ্য দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে, সে কোনো সীমাবদ্ধতা হতে নিজেকে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করে যখন সে নিজের সাথেই দ্বন্দ্বে পড়ে, সে নিজেকে এই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নিয়ে নিয়ে যায় এক অমূর্ত, সীমিত আর আংশিক পথে। এ থেকে আরো পাওয়া গেল যে, রাজনৈতিকভাবে নিজেকে মুক্ত করে মানুষ *ঘুরপথে* নিজেকে মুক্ত করে, *এক মাধ্যমিক পথে, যদিও তা আবশ্যিক মাধ্যমিকতা*। চূড়ান্ত বিচারে পাওয়া গেল যে মানুষ নিজেকে রাষ্ট্রের মাধ্যমে নাস্তিক ঘোষণা করলেও—মানে সে রাষ্ট্রকে নাস্তিক ঘোষণা করলেও তখনো ধর্মের কব্জার মধ্যে থেকে যায়, সোজা কথায় তার কারণ হলো, সে নিজেকে কেবল ঘুরপথে, কেবল এক মাধ্যমিকতার মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। ধর্ম হলো, সোজা কথায় এক মাধ্যমিকতার মধ্য দিয়ে, এক ঘুরপথের স্বীকৃতি। রাষ্ট্র হলো মানুষ আর মানুষের মুক্তির মাঝে মাধ্যমিকতা। যেমন, খ্রিষ্টের মতো মাধ্যমিকতার ওপরে মানুষ তার দৈবিকতার সব বোঝা, সব ধর্মীয় ঝামেলা চালান করে দেয়, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র হলো সেই মাধ্যমিকতা যার ওপরে মানুষ তার সব অ-দৈবিক, তার সব *মানবিক ঝামেলা* চালান করে।

ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষের *রাজনৈতিক* উত্তরণে সাধারণভাবে রাজনৈতিক উত্তরণের সমস্ত খুঁত আর সমস্ত সুবিধা থেকে যায়। যেমন, রাষ্ট্র হিসেবে *রাষ্ট্র ব্যক্তিসম্পত্তি* রদ করে, নির্বাচিত হওয়া বা নির্বাচত করবার জন্য যখনই *সম্পত্তি যোগ্যতা রদ* করা হয় তখনই *রাজনৈতিক* উপায়ে মানুষ ঘোষণা করে যে, ব্যক্তিসম্পত্তি *রহিত* হলো। উত্তর আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রে এমন ঘটেছে। হ্যামিলটন বেশ সঠিকভাবেই এই বাস্তবতাকে *রাজনৈতিক* দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন: "সম্পত্তি মালিক আর লগ্নি ধনদৌলতকে টেক্কা

দিয়ে জনসাধারণ একদান জিতে নিয়েছে।" (Man and Manners in America)

সম্পত্তিহীনরা যদি সম্পত্তি মালিকদের আইন প্রণয়নকারী হয় তাহলে ভাবগতভাবে কি ব্যক্তিসম্পত্তি রহিত হয়ে যায় না? ভোট দেয়ার অধিকারের জন্য সম্পত্তি যোগ্যতা হলো ব্যক্তিসম্পত্তিকে স্বীকৃতি দেয়ার শেষ রাজনৈতিক আঙ্গিক। তবে ব্যক্তিসম্পত্তির রাজনৈতিক রদকরণ শুধু ব্যক্তিসম্পত্তি উৎখাতেই ব্যর্থ নয়, তা বরং একে পূর্বানুমান করে। রাষ্ট্র যখন ঘোষণা করে যে *জন্ম, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা, পেশা*—এসব *অ-রাজনৈতিক* বৈশিষ্ট্য, যখন তা ঘোষণা করে যে এসব পার্থক্য বিচারে না এনে জাতির প্রতিটি সদস্য জাতীয় সার্বভৌমত্বে *সমান* অংশীদার, যখন তা জাতির বাস্তব জীবনের সমস্ত উপাদান রাষ্ট্রের জায়গা থেকে বিচার করে—রাষ্ট্র তখন নিজের মতো করে জন্ম, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা, পেশার পার্থক্য বিচার তিরোহিত করে। তবে এও ঠিক যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিসম্পত্তি, শিক্ষা, পেশাকে তাদের মতো করেই কাজ করতে দেয়—মানে এগুলোকে ব্যক্তিসম্পত্তি হিসেবে, শিক্ষা হিসেবে, পেশা হিসেবে চলতে দেয় আর তাদের বিশেষ স্বভাবের প্রভাবও খাটাতে দেয়। এসব বাস্তব ভিন্নতা দূর করা তো দূরের কথা, এসবের অস্তিত্ব আগে থেকেই মেনে নেয়াতে কেবল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কায়েম থাকে। এর অস্তিত্বের এসব উপাদানের বিপরীতেই কেবল সে নিজেকে এক রাজনৈতিক রাষ্ট্র বলে অনুভব করতে পারে আর এর *সার্বিকতা* জাহির করতে পারে। হেগেল তাই রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক খুব সঠিকভাবেই সংজ্ঞায়িত করেন:

> রাষ্ট্র যাতে করে মনের **নৈতিক বাস্তবতা**, *নিজেকে জানতে থাকা* কিছু একটা হিসেবে অস্তিত্বমান হয়, তার জন্য কর্তৃত্ব আর বিশ্বাসের আঙ্গিক থেকে একে তফাৎ করাটা আবশ্যিক। তবে ধর্মতান্ত্রিক দিকটা নিজের মাঝে এসে যতটা তফাত হয় এই বিভাযনের বৈশিষ্ট্য ঠিক ততটাই উঠে আসে। **কেবল** এই পথেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর **ওপরে** রাষ্ট্র তার চিন্তার সার্বিকতা অর্জন করেছে এবং অস্তিত্বমান করেছে। এবং এটাই এর মূল রূপ।" (Hegel's Philosophy of Right, 1st Edition, P-346)

অবশ্যই! কেবল এমনি করেই বিশেষ উপাদানগুলোর ওপরে রাষ্ট্র নিজেকে সার্বিকতা হিসেবে গঠন করে।

নিজের স্বভাব অনুযায়ীই নিখুঁত রাজনৈতিক রাষ্ট্র হলো মানুষের বস্তুগত জীবনের *বিরোধিতা* হিসেবে তার *প্রজাতি জীবন*। এই অহংবাদী জীবনের সমস্ত পূর্বশর্ত রাষ্ট্রের বলয়ের বাইরে সিভিল সমাজে বহাল থাকে সিভিল সমাজের গুণাবলী হিসেবে। রাজনৈতিক রাষ্ট্র যেখানে এর সত্যিকারের বিকাশ লাভ করেছে মানুষ সেখানে শুধু চিন্তা, চৈতন্যে নয়, *বাস্তবে*, *জীবনেও* দু'মুখো জীবনযাপন করে। এর একটা দৈব জীবন, আরেকটা জাগতিক জীবন। একদিকে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে কাটানো জীবন, যেখানে সে নিজেকে বিচার করে এক সম্প্রদায় সত্ত্বা হিসেবে। অপরদিকে *সিভিল সমাজের* জীবন যেখানে সে ক্রিয়া করে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে, অন্য মানুষ তার কাছে সেখানে কার্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। নিজেকেও সে নামিয়ে আনে উপায়ের পর্যায়ে, হয়ে যায় বিজাতীয় সব শক্তির ক্রীড়নক। পরকালের সঙ্গে দুনিয়ার সম্পর্ক যতটা মরমী, *সিভিল সমাজের* সাথে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঠিক ততটাই মরমী। রাজনৈতিক রাষ্ট্র সিভিল সমাজের ঠিক তেমনই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্ম যেমন সংকীর্ণ দুনিয়াবি জগতের ওপর ছেয়ে থাকে, রাজনৈতিক রাষ্ট্রও তেমনি ছেয়ে থাকে সিভিল সমাজের ওপর। মানে একে সবসময় স্বীকৃতি দেয়, পুনরুদ্ধার করে আর নিজেকে এর আধিপত্যে থাকতে দেয়। সিভিল সমাজে—মানে তার সবচেয়ে *অ-পরোক্ষ বাস্তবতায়* মানুষ এক জাগতিক সত্ত্বা। এখানে, নিজেকে যেখানে সে বিচার করে এক *বাস্তব স্বতন্ত্র* হিসেবে, অন্যরাও তাকে তেমন করেই দেখে। যেখানে আসলে সে এক কল্প-প্রপঞ্চ। অপরদিকে রাষ্ট্রে যেখানে সে বিবেচিত এক প্রজাতি সত্ত্বা হিসেবে, মায়াময় সার্বভৌমত্বের এক কাল্পনিক সদস্য হিসেবে, সেখানে সে বাস্তব ব্যক্তিজীবন হতে বঞ্চিত হয়ে পায় এক অবাস্তব সার্বিকতা।

কোনো *বিশেষ* ধর্মের অনুসারী হিসেবে মানুষ তার নাগরিকত্বের সাথে আর সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে অপর মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব খুঁজে পায়। এই দ্বন্দ্ব নিজেকে *রাজনৈতিক রাষ্ট্র* আর সিভিল সমাজের মাঝের জাগতিক বিভাজনের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। *বুর্জোয়া* হিসেবে মানুষের 'রাষ্ট্রের মাঝে জীবন' হলো 'কেবল আবশ্যিক এবং নিয়মের সদৃশ বা এক সাময়িক ব্যতিক্রম।' অবশ্যই ইহুদিদের মতো *বুর্জোয়ারাও* কেবল আলগাভাবেই রাজনৈতিক জীবনের বলয়ে থাকে, ঠিক যেমন নাগরিক কেবল আলগাভাবেই একজন ইহুদি বা বুর্জোয়া থাকে। কিন্তু এই গা বাঁচানো এটা

স্বয়ং রাজনৈতিক রাষ্ট্রের *গা বাঁচানো*। ধার্মিক মানুষ আর নাগরিকের মাঝের ব্যবধান হচ্ছে বণিক এবং নাগরিকের মাঝের, দিনমজুর এবং নাগরিকের মাঝের, ভূমি মালিক এবং নাগরিকের মাঝের, *জীবন্ত ব্যক্তি এবং নাগরিকের* মাঝের ব্যবধান। ধার্মিক মানুষ রাজনৈতিক মানুষের সাথে যে দ্বন্দ্ব খুঁজে পায় তার সঙ্গে বুর্জোয়ার সাথে নাগরিক এবং সিভিল সমাজের সদস্যের সাথে তার *রাজনৈতিক সিংহের খোলসের* দ্বন্দ্বের তফাৎ নেই।

ইহুদি প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত নিজেকে যে জাগতিক দ্বন্দ্বে পর্যবসিত করে, রাজনৈতিক রাষ্ট্র এবং তার পূর্বশর্তসমূহের দ্বন্দ্ব (তা সে ব্যক্তিসম্পত্তির ইত্যাদির মতো বস্তুগত উপাদান হোক বা ধর্ম বা সংস্কৃতির মতো মরমী উপাদান হোক), *সাধারণ স্বার্থ* আর *ব্যক্তিস্বার্থের* মাঝের বিরোধ, *রাজনৈতিক রাষ্ট্র* আর *সিভিল সমাজের* মাঝের ঝামেলা—এসব জাগতিক এন্টিথিসিস বহাল থাকতে দিতে বাউয়ের-এর আপত্তি নেই। অথচ তিনি এসবের *ধর্মীয় প্রকাশের* বিরুদ্ধে তর্ক চালিয়ে যান।

> "মোদ্দা কথায় সিভিল সমাজের ভিত্তিতে যে প্রয়োজনে এই সমাজের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয় এবং এর প্রয়োজনীয়তার জামিন দেয় (যা এর অস্তিত্বধারা বহমান বিপদের মাঝে প্রকাশ করে) সেই প্রয়োজনে এক অনিশ্চয়তার উপাদান রক্ষিত হয়। সেখান হতে দারিদ্র্য আর সম্পদের, দুর্গতি আর সমৃদ্ধির অনবরত পরিবর্তনশীল এক মিশ্রণ উৎপাদন করে এবং সাধারণভাবে এক পরিবর্তন নিয়ে আসে। (পৃষ্ঠা-৮)

পুরো 'সিভিল সমাজ' (পৃষ্ঠা-৮-৯) অধ্যায়টুকু তুলনা করে দেখুন, যা হেগেলের আইন দর্শনের মূল ছক অনুসারে তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক রাষ্ট্রের বিপরীতে সিভিল সমাজ আবশ্যিক বলে স্বীকৃত হয়েছে কারণ রাজনৈতিক রাষ্ট্র আবশ্যিক বলে স্বীকৃত।

রাজনৈতিক মুক্তি নিঃসন্দেহে এক বিশাল অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। সত্য যে, এটা সাধারণভাবে মানবমুক্তির চূড়ান্ত রূপ নয়, তবে তা বহাল জগৎ সম্পর্কের *মাঝে* মানবমুক্তির চূড়ান্ত রূপ। বলাবাহুল্য, আমরা এখানে বাস্তব, ব্যবহারিক মুক্তির কথা বলছি।

মানুষ ধর্ম হতে *রাজনৈতিকভাবে* নিজেকে মুক্ত করে জনআইনের বলয় হতে একে নিশ্চিহ্ন করে ব্যক্তি আইনে পরিণত করে। ধর্ম আর *রাষ্ট্রের* মরম (Spirit) নয় যেখানে মানুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর মানুষের সাথে আচরণ

করে এক প্রজাতি-সত্ত্বা হিসেবে (যদিও তা সীমিত, নির্দিষ্ট রূপে, আর নির্দিষ্ট বলয়ে)। ধর্ম হয়ে গেছে সিভিল সমাজের, অহংবাদী বলয়ের, *প্রত্যেকে সবার বিরুদ্ধে*—এই ভাবের মরম। তা আর *সম্প্রদায়ের* নয় বরং *ব্যবধানের* সারসত্ত্বা। ধর্ম হয়ে গেছে মানুষের তার সম্প্রদায় হতে, নিজ হতে আর অপর মানুষ হতে *বিচ্ছিন্নতার* প্রকাশ। আসলে সে ছিলও তাই। এ কেবল নির্দিষ্ট নষ্টামির, *ব্যক্তি হুজুগের* এবং আত্ম-বিরোধিতার অমূর্ত ব্রত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উত্তর আমেরিকায় ধর্মের অন্তহীন তরিকায় ভাগ হয়ে যাওয়া একে এমন কি *বাহ্যিকভাবেও* এক নিখাদ ব্যক্তিগত বিষয়ের রূপ দিয়েছে। বহুমাত্রিক ব্যক্তিস্বার্থের মাঝে তা হাজির হয়েছে এক ধাক্কা হিসেবে এবং চলে গেছে একরকম সম্প্রদায়ের বাইরে। তবে রাজনৈতিক মুক্তির সীমা সম্পর্কে কারুর ধন্দ থাকা ঠিক নয়। মানব জাতির *জন-মানুষ* আর *ব্যক্তি মানুষে* বিভাজন, রাষ্ট্র হতে সিভিল সমাজে ধর্মের *খসে পড়া*—এটা রাজনৈতিক মুক্তির স্তর নয় বরং এর *সম্পূর্ণতা* সাধন। এই মুক্তি তাই মানুষের বাস্তব ধার্মিকতা রদ করেনি, করতে চায়ওনি।

ইহুদি এবং নাগরিক, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং নাগরিক, ধার্মিক মানুষ এবং নাগরিক ইত্যাদিতে মানুষের বিভাজন নাগরিকত্বের *বিরুদ্ধে* চালিত কোনো ছলনা নয়, রাজনৈতিক মুক্তির কোনো বাধা-নিষেধও নয়। এ হলো *খোদ রাজনৈতিক মুক্তি*, ধর্ম হতে কারো নিজেকে মুক্ত করার *রাজনৈতিক* পদ্ধতি। যখন এরকম রাজনৈতিক রাষ্ট্র সিভিল সমাজের মাঝ হতে সহিংসভাবে জন্ম নেয়, যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের রূপ—সে সময়ে রাষ্ট্র যতদূর সম্ভব *ধর্মের রদ*, ধ্বংস পর্যন্ত যেতে পারে এবং অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু এ কাজ সে একইভাবে অতটুকুই করতে পারে ঠিক যেমন ব্যক্তিসম্পত্তি উচ্ছেদ করতে যেয়ে খুব বেশি হলে তা অধিগ্রহণ, প্রগতিশীল কর আরোপ পর্যন্ত যায়, ঠিক যেমন যায় প্রাণ উচ্ছেদ করতে *গিলোটিন* পর্যন্ত। বিশেষ আত্মবিশ্বাসের কালে রাজনৈতিক জীবন তার পূর্ব প্রয়োজনগুলো (সিভিল সমাজ এবং এই সমাজ গঠনকারী উপাদানসমূহ) দাবিয়ে রাখতে চায় এবং চায় নিজেকে দ্বন্দ্ব রহিত, মানুষের বাস্তব প্রজাতি জীবন হিসেবে গড়ে তুলতে। কিন্তু তা সে অর্জন করতে পারে কেবল নিজের জীবনের বাস্তব অবস্থার সাথে সহিংস দ্বন্দ্বে গিয়ে, বিপ্লবকে *স্থায়ী* ঘোষণা

দিয়ে, আর তাই, রাজনৈতিক নাটক আবশ্যিকভাবেই শেষ হয় ধর্ম, ব্যক্তিসম্পত্তি এবং সিভিল সমাজের সমস্ত উপাদানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ঠিক যেমন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে শান্তিতে।

আদতে একটি আদর্শ বা নিখুঁত খ্রিষ্টান রাষ্ট্র তথাকথিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের মতো নয় যে কিনা ধর্মকে এর ভিত্তি হিসেবে, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ফলত অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিশেষ আচরণ গ্রহণ করে। বরং নিখুঁত খ্রিষ্টান রাষ্ট্র হলো *নাস্তিক রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র*, যে রাষ্ট্র ধর্মকে সিভিল সমাজের অন্যসব উপাদানের সাথে স্থান দেয়। যে রাষ্ট্র এখনো ধর্মতাত্ত্বিক, যে এখনো খ্রিষ্টানত্বকে তার উৎস বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে, যার এখনো নিজেকে *রাষ্ট্র হিসেবে* ঘোষণা করবার সাহস নেই—রাষ্ট্র হিসেবে বাস্তবত সে এখনো মানবিক ভিত্তিগুলোকে (খ্রিষ্টানত্ব যার গায়েবি প্রকাশ) *জাগতিক, মানবিক* রূপে প্রকাশ করতে সফল হয়নি। তথাকথিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্র সোজা কথায় *অ-রাষ্ট্রের* বেশি কিছু নয়, যেহেতু ধর্ম হিসেবে খ্রিষ্টানত্ব নয় বরং কেবল খ্রিষ্টান ধর্মের *মানবিক প্রেক্ষাপটই* বাস্তব মানবিক সৃষ্টিতে এর প্রকাশ খুঁজে পেতে পারে।

তথাকথিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্র হলো রাষ্ট্রের খ্রিষ্টীয় নেতিকরণ, কোনো মতেই তা খ্রিষ্টানত্বের রাজনৈতিক বাস্তবায়ন নয়। যে রাষ্ট্র এখনো খ্রিষ্টানত্বকে ধর্মীয় রূপে মানে, এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রতি যথার্থ হয় এমন আঙ্গিকে স্বীকার করেন, ধর্মের প্রতি সে রাষ্ট্রের এখনো ধর্মীয় আচরণই আছে—অর্থাৎ এটা ধর্মের মানবিক ভিত্তির *সত্যিকারের প্রয়োগ* নয়, কারণ তা এখনো এই মানবিক শাঁসটির *অবাস্তব, কাল্পনিক* রূপটির ওপরই ভর করে আছে। তথাকথিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্র হলো *অসম্পূর্ণ* রাষ্ট্র, আর খ্রিষ্টান ধর্ম হলো সেই *অসম্পূর্ণতার* ঘাটতি পোষণের ফাউ, একে ধুপ ধুনো দিয়ে পবিত্র করা। তাই খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের জন্য ধর্ম আবশ্যিকভাবেই হয়ে পড়ে উদ্দেশ্য হাসিলের এক *উপায়*; কাজেই এটা এক ভণ্ড *রাষ্ট্র*। *সম্পূর্ণ* রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাধারণ *স্বভাবহেতু* এর ভেতরে থাকা খুঁতের জন্য ধর্মকে পূর্বানুমানসমূহের মাঝে গণ্য করে, নাকি *অসম্পূর্ণ* রাষ্ট্র খুঁতওয়ালা রাষ্ট্র হিসেবে এর বিশেষ *অস্তিত্বের* মাঝে থাকা ঘাটতির কারণে ধর্মকে তার ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা দেয়—এই দুটো ধরন এক বড় পার্থক্য তৈরি করে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ধর্ম হয়ে পড়ে *অসম্পূর্ণ রাজনীতি*। প্রথমটির ক্ষেত্রে এমনকি নিখুঁত *রাজনীতিরও* খুঁত ধর্মের মাঝে

স্পষ্ট হয়ে যায়। তথাকথিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের খ্রিষ্টান ধর্মের দরকার পড়ে নিজেকে *রাষ্ট্র* হিসেবে সম্পূর্ণ করতে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, প্রকৃত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পূর্ণতার জন্য ধর্মের দরকার হয় না। বরং তা ধর্মকে উপেক্ষা করতে পারে কারণ এর মাঝে ধর্মের মানবিক ভিত্তি জাগতিক উপায়ে বাস্তবায়িত হয়ে যায়। অপরদিকে তথাকথিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের ধর্মের প্রতি থাকে রাজনৈতিক মনোভাব আর রাজনীতির প্রতি থাকে ধর্মীয় মনোভাব। রাষ্ট্রের আঙ্গিককে নিতান্ত সদৃশে নামিয়ে এনে সে ধর্মকেও নিতান্ত সদৃশে নামিয়ে আনে।

এই দ্বন্দ্বটাকে আরো পরিষ্কার করতে বাউয়ের কেমন করে খ্রিষ্টান রাষ্ট্রকে দেখান তা যাচাই করা যাক। এক্ষেত্রে তিনি খ্রিষ্টীয়-জর্মন রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ কাজে লাগিয়েছেন। বাউয়ের বলছেন,

> "কোনো খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের *অসম্ভাব্যতা বা অনস্তিত্ব* প্রমাণ করতে ইদানীং প্রায়ই সুসমাচারের বাণীগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয়। যার সাথে (বর্তমানের) রাষ্ট্র শুধু যে *তাল মেলায় না* তাই নয়, বরং সম্ভবত *তাল মেলাতে সক্ষমই নয়,* যদি না সে নিজেকে (রাষ্ট্র হিসেবে) একেবারে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে চায়।" "কিন্তু সমস্যাটার সুরাহা এত সহজ নয়। *সুসমাচারের* বাণীগুলো কি দাবি করে? আত্মসত্তার অতিন্দ্রীয় পরিত্যাগ, প্রত্যাদেশের অধিকর্তার কাছে সমর্পণ, রাষ্ট্রের কাছ হতে ফিরে দাঁড়ানো, জাগতিক শর্তসমূহের বিনাশ। বেশ, খ্রিষ্টীয় রাষ্ট্র এসব দাবি করে এবং সবই অর্জন করে। সে *সুসমাচারের মরম* সন্নিবেশ করলো, এবার সে যদি এই মরম সুসমাচারের অবিকল পরিভাষায় ফের পয়দা না করে তাহলে তা ঘটে কেবল এই কারণে যে, সে এই মরম প্রকাশ করে রাজনৈতিক আঙ্গিকে। অর্থাৎ সত্য যে, এই আঙ্গিক বর্তমান দুনিয়ার চলতি রাজনৈতিক পদ্ধতি হতে নেয়া, তবে তাদের যে ধর্মীয় পুনর্জন্মের মাঝ দিয়ে যেতে হবে তা নেমে আসে নিতান্ত সদৃশের পর্যায়ে। এ হলো তার নিজেকে বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক আঙ্গিকের ব্যবহার করতে গিয়ে রাষ্ট্রের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ানো।" (পৃষ্ঠা-৫৫)

বাউয়ের তারপর ব্যাখ্যা করে দেখান যে, খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের জনগণ কেবল অ-জনগণ, যাদের নিজেদের আর কোনো ইচ্ছা বলতে কিছু নেই। তাদের আসল অস্তিত্ব তাদের অধীন করে নেয়া নেতার মাঝে বিরাজমান, যদিও এই নেতা তার উৎস আর স্বভাব অনুযায়ীই তার কাছে বিজাতীয়—মানে,

খোদার কাছ হতে পাঠানো, জনগণের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ ছাড়াই তাদের ওপর আরোপিত। বাউয়ের ঘোষণা করেন যে, এরকম জনগণের আইন তাদের নিজের সৃষ্টি নয়, তা বরং প্রকৃত প্রত্যাদেশ; এর সর্বোচ্চ প্রধানের জনগণের সাথে, আরো ঠিক করে বললে জনসমষ্টির সাথে মাধ্যমিকতার দরকার। এই জনসমষ্টি আবার নিজেরাও অসংখ্য বিশেষ দলে বিভক্ত যা কিনা আকস্মিকতা দ্বারা নির্ধারিত এবং গঠিত, তাদের স্বার্থ, নির্দিষ্ট আবেগ আর মূল্যবোধ দিয়ে পার্থক্যকৃত এবং যারা সুবিধা হিসেবে নিজেদের একে অপরের কাছ হতে নিঃসঙ্গ করার অনুমতি লাভ করে, ইত্যাদি। (পৃষ্ঠা-৫৬)

যা হোক, বাউয়ের নিজেই বলছেন,

> "রাজনীতি যদি ধর্ম ছাড়া কিছু নাই হতে পারে, তবে তার রাজনীতি হওয়া উচিত নয়, ঠিক যেমন দরগার হাঁড়ি-বাসন মাজাকে গেরস্থালি কাজ বলা ঠিক নয়।" (পৃষ্ঠা-১০৮)

তবে খ্রিষ্টীয়-জর্মন রাষ্ট্রে ধর্ম একটা 'অর্থনৈতিক ব্যাপার' ঠিক যেমন 'অর্থনৈতিক ব্যাপার'গুলো এখানে ধর্মের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ। খ্রিষ্টীয়-জর্মন রাষ্ট্রে ধর্মের আধিপত্য হলো আধিপত্যের ধর্ম।

'সুসমাচারের অক্ষর'গুলো থেকে "সুসমাচারের মরমকে" আলাদা করে ফেলা একটা *অধর্মের* কাজ। যে রাষ্ট্র সুসমাচারকে রাজনীতির ভাষায় কথা বলায়—অর্থাৎ যে ভাষা 'পবিত্র আত্মা'র ভাষা হতে ভিন্ন, সে তো অধর্ম করে। তা মানবদৃষ্টিতে না হোক, নিজ ধর্মের দৃষ্টিতে অধর্ম। যে রাষ্ট্র খ্রিষ্টানত্বকে তার চরম বৈশিষ্ট্য বলে মানে, বাইবেলকে বলে নিজের *সনদ*, তাকে অবশ্যই পবিত্র গ্রন্থের শব্দাবলির মোকাবিলা করতে হবে, কারণ সে গ্রন্থের প্রতিটি শব্দই পবিত্র। এই রাষ্ট্র, সাথে সেইসব *মানবিক আবর্জনা* যার ওপর সে ভিত্তি করে আছে তা এক যন্ত্রণাদায়ক দ্বন্দ্বে আটকা পড়ে গেছে। এই দ্বন্দ্ব ধর্মীয় চৈতন্যের অবস্থান হতে কিছুতেই সমাধানযোগ্য নয়—যখন সে সুসমাচারের সেই সব বাণীর বরাত নেয় যার সাথে তা "*শুধু যে তাল মেলায় না তাই নয় বরং সম্ভবত তাল মেলাতে সক্ষমই নয়*, যদি না তা নিজেকে রাষ্ট্র হিসেবে একেবারে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে চায়।" কেন সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে চায় না? রাষ্ট্র নিজে নিজের কাছে বা অন্য কারুর কাছে এর উত্তর দিতে পারে না। পোশাকি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র তার নিজের চৈতন্যের কাছে এক হুকুম, যার বাস্তবায়ন অর্জনযোগ্য নয়। রাষ্ট্র তার

অস্তিত্বের *বাস্তবতা* কেবল নিজের কাছে মিথ্যে বলেই বিবৃত করতে পারে। ফলে সে নিজের কাছেই সব সময় হয়ে থাকে এক সন্দেহের, ভরসার অযোগ্য, ঝামেলার বিষয়। অতএব সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয় যখন সে জোরের সাথে বাইবেলের ওপর নির্ভর করা রাষ্ট্রকে মানসিক অবিন্যস্ত তার পর্যায়ে বিবেচনা করে—যার মাঝে সে আর জানেই না যে সে কী মায়া না বাস্তবতা। এবং যার মাঝে জাগতিক লক্ষ্যের কলঙ্ক (ধর্ম যার আলখেল্লার কাজ করে) তার ধর্মীয় চৈতন্যের সততার সাথে (যার কাছে ধর্মই জগতের উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়) এক অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র নিজের আত্মপীড়নের কাছ হতে বাঁচতে পারে কেবল যদি সে ক্যাথলিক চার্চের *পুলিশ এজেন্ট* হয়ে যায়। চার্চের সাথে সম্পর্কের নিরিখে (যে চার্চ *জাগতিক* শক্তিকে তার চাকর বলে ঘোষণা করে) রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন, ধর্মীয় মরমের নিয়ম বলে দাবি করা জাগতিক ক্ষমতাও অথর্ব।

তথাকথিত খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের মাঝে *মানুষ* নয়, *বিচ্ছিন্নতাই* মোদ্দা কথা। একমাত্র মানুষ রাজা, যে কিনা গণনার অধিকার রাখে, সেও অপর মানুষ হতে বিশেষভাবে আলাদা আর সর্বোপরি ধার্মিক সত্ত্বা বলে সরাসরি খোদার সাথে, স্বর্গের সাথে গাঁটছড়ায় বাঁধা। একমাত্র সম্পর্ক যা বিরাজমান তা এখনো বিশ্বাস নির্ভর সম্পর্ক। অতএব, ধার্মিক মরম এখনো বাস্তবিক ইহজাগতিক হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু, তদুপরি ধর্মীয় মরমকে *বাস্তবিকভাবে* ইহজাগতিক করা যায় না। কারণ সে খোদ নিজের কাছে মানব মনের বিকাশের পর্যায়ে এক অ-জাগতিক স্তর ছাড়া আর কিছু কি? ধর্মীয় মরমকে মানব মনের বিকাশের স্তর পর্যন্তই কেবল ইহজাগতিক করা যায়। ধর্মীয় প্রকাশ যার বহিরাঙ্গিক তৈরি করে এবং স্থাপিত হয় জাগতিক আঙ্গিকের ভেতরে। ব্যাপারটা ঘটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। এই রাষ্ট্রের ভিত্তি খ্রিষ্টানত্ব নয়, বরং খ্রিষ্টানত্বের *মানবিক ভিত*। ধর্ম থেকে যায় এর সদস্যদের আদর্শিক, অজাগতিক চৈতন্য হয়ে, কারণ ধর্ম এই রাষ্ট্রের মাঝে অর্জিত *মানবিক বিকাশের স্তরের* আদর্শ আঙ্গিক।

রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সদস্যদের ধার্মিক হয়ে থেকে যাওয়ার কারণ ব্যক্তি জীবন আর প্রজাতি জীবনের, সিভিল সমাজের জীবন আর রাজনৈতিক জীবনের মাঝের দ্বৈততা। তারা ধার্মিক কারণ মানুষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনকে বিবেচনা করে তাদের বাস্তব স্বাতন্ত্রিকতার বাইরের এলাকা হিসেবে যেন সেটাই তাদের সত্যিকারের জীবন। তারা যেই পরিমাণে

ধার্মিক যে পরিমাণে ধর্ম এখানে সিভিল সমাজের মরম যা প্রকাশ করে মানুষ হতে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব। রাজনৈতিক গণতন্ত্র এখানে খ্রিষ্টীয় যদিও এর মাঝে একজন নয়, প্রতিটি মানুষই *সার্বভৌম*, সর্বোচ্চ সত্ত্বার মর্যাদা পায়, কিন্তু তা থাকে তার অসভ্য, অসামাজিক রূপে, তার দৈব অস্তিত্বে, সে যেমন ঠিক তেমনভাবে, আমাদের সমাজের সমস্ত সংগঠন তাকে যেমনভাবে নষ্ট করে রেখেছে তেমনভাবেই, যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, নিজের কাছেই বিজাতীয় হয়ে গেছে, আর অমানবিক সব উপাদান ও শর্তের হাতে শাসিত হতে হাত বদল হয়ে গেছে সংক্ষেপে, যে মানুষ এখনো *সত্যিকারের* প্রজাতি সত্ত্বা নয়। কল্পনার সৃষ্টি একটা স্বপ্ন, খ্রিষ্টানত্বের এক স্বীকার্য যে মানুষের সার্বভৌমত্ব (এমন মানুষ সে কিনা বিজাতীয় সত্তা হিসেবে বাস্তব মানুষ হতে ভিন্ন) গণতন্ত্রে তাই হয়ে ওঠে সম্ভব রকম বাস্তব, বহাল অস্তিত্ব ও জাগতিক নীতি।

নিখুঁত গণতন্ত্রে ধর্মীয় এবং ধর্মতাত্ত্বিক চৈতন্য খোদ নিজেই নিজের দৃষ্টিতে অধিকতর ধার্মিক ও ধর্মতাত্ত্বিক। কারণ দৃশ্যত তা এখানে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যহীন, জাগতিক উদ্দেশ্যবিহীন। আরো কারণ এই যে, তা সত্যিকারভাবেই আরেক দুনিয়ার জীবন। খ্রিষ্টানত্ব এখানে তার সার্বিক ধর্মীয় তাৎপর্যের ব্যবহারিক প্রকাশে উন্নীত হয়েছে। তাতে সবচেয়ে বহুমুখী বিশ্ববীক্ষা একে অপরের পাশাপাশি খ্রিষ্টানত্বের রূপে এক কাতারে এসেছে আর সবচেয়ে বড় কথা এখানে কাউকে খ্রিষ্টানত্বে দীক্ষা নিতে হয় না, সাধারণভাবে ধর্ম, যে কোনো ধর্ম হলেই কাজ চলে (বিউমঁদের পূর্ব উদ্ধৃতি খেয়াল করুন)। ধর্মীয় চৈতন্য পরমানন্দ লাভ করে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব আর ধর্মীয় বহুমুখিনতার সম্পদে।

এইভাবে আমরা দেখিয়েছি যে, ধর্ম হতে রাজনৈতিক মুক্তি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ধর্ম হিসেবে না হলেও ধর্মের অস্তিত্ব বহাল রেখে দেয়। কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী তার নাগরিকত্বের সাথে সম্পর্কের নিরিখে যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন তা *রাজনৈতিক রাষ্ট্র আর সিভিল সমাজের মাঝের সার্বিক ইহজাগতিক দ্বন্দ্বের* কেবল *একটি দিক*। খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের সম্পূর্ণতা মানে এমন এক রাষ্ট্র যা নিজেকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে এবং এর সদস্যদের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। ধর্ম হতে রাষ্ট্রের মুক্তি বাস্তব মানুষের ধর্ম হতে মুক্তি নয়।

অতএব, আমরা বাউয়ের-এর মতো ইহুদিদের বলি না যে: ইহুদিবাদ

হতে আমূলভাবে নিজেদের মুক্ত না করলে তোমরা রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হতে পারবে না। আমরা বরং উল্টোভাবে তাদের বলি: যেহেতু সম্পূর্ণভাবে এবং তর্কাতীতভাবে ইহুদিবাদ পরিত্যাগ না করেও তোমরা *রাজনৈতিকভাবে মুক্ত* হতে পারো, তাই *রাজনৈতিক মুক্তি* খোদ নিজে *মানব মুক্তি* নয়। নিজেদের মানবিকভাবে মুক্ত না করে তোমরা ইহুদিরা যদি রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হতে চাও, এই ভিতু কেতা এবং দ্বন্দ্ব শুধু যে তোমাদের মাঝে আছে এমন নয়, এটা স্বয়ং রাজনৈতিক মুক্তির *স্বভাব* আর *বর্গের* মাঝেই অন্তর্নিহিত। যদি দেখ যে তোমরা এই বর্গের হাজতখানায় বন্দি, দেখবে সেখানে বাকি সবাইও আটকা পড়ে আছে। রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিদের প্রতি খ্রিষ্টীয় ভঙ্গি গ্রহণ করে রাষ্ট্র যেমন খ্রিষ্টীয় বাণী প্রচারে নামে ঠিক তেমনি ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও যখন ইহুদিরা নাগরিক অধিকার দাবি করে, তখন *সে রাজনীতিসম্মত* আচরণই করে।

যদি ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও কেউ রাজনৈতিকভাবে মুক্তি আর নাগরিক অধিকার পেতে পারে, তবে কি সে তথাকথিত *মানব অধিকার* চেয়ে তা পেতে পারে? বাউয়ের তা *অস্বীকার* করেন।

> "প্রশ্নটা হলো একজন ইহুদি হিসেবে কেউ (মানে যে নিজেই স্বীকার করে যে তার সত্যিকারের স্বভাবেরই কারণেই সে অপর মানুষ হতে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য) *মানুষের সার্বিক অধিকার* পেতে এবং অন্যের সাথে তা ভাগ করতে সক্ষম কি না"
>
> "খ্রিষ্টান জগতে মানুষের অধিকারের ধারণাটি সবে গেল শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষের মাঝে তা অন্তর্নিহিত নয়, বরং এখন পর্যন্ত মানুষ যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে এটা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পাওয়া। ফলে মানুষের অধিকার প্রকৃতির কোনো উপহার নয়, অতীত ইতিহাসের কোনো উত্তরাধিকার নয়, বরং তা জন্মের আপতিকতা আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এখনো পর্যন্ত ইতিহাস কর্তৃক তুলে দেয়া সেই সব সুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পুরস্কার। এসব অধিকার হলো সংস্কৃতির ফল, যে তা অর্জন করেছে আর যার তা পাওনা—কেবল সেই তা অধিকারে রাখতে পারে।"
>
> "ইহুদিরা কি বাস্তবেই তা পেতে পারে? যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইহুদি, তাকে ইহুদি করে তোলা ধরাবাঁধা স্বভাবই তার মানব স্বভাব, যে স্বভাব তাকে অন্য মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে, তাকে বাধ্যতামূলকভাবে টেক্কা মেরে যাবে, এবং বিচ্ছিন্ন করবে ইহুদি নয় এমন মানুষ হতে। এই বিচ্ছিন্নতার

মাধ্যমে সে ঘোষণা করে যে তাকে ইহুদি করে তোলা বিশেষ স্বভাবই তার জন্য সত্য, চূড়ান্ত স্বভাব যার সামনে মানব স্বভাব পালিয়ে বাঁচে।"
"একইভাবে, খ্রিষ্টান হিসেবে খ্রিষ্টানও মানব অধিকার অনুমোদন করতে পারে না।" (পৃষ্ঠা-১৯, ২০)

বাউয়েরের মতে, সার্বিক মানব অধিকার পাওয়ার যোগ্য হতে হলে মানুষকে *'বিশ্বাসের বিশেষ সুবিধা'* ত্যাগ করতে হবে। আপাতত চলুন, আমরা তথাকথিত মানব অধিকার বিষয়টি যাচাই করে দেখি। ঠিক করে বললে, মানব অধিকারের খাঁটি রূপ, যে আঙ্গিকে তা এর *আবিষ্কারক* উত্তর আমেরিকান আর ফরাসিদের কাছে আছে তাই যাচাই করি। আংশিকভাবে মানুষের এই অধিকারসমূহ হলো *রাজনৈতিক* অধিকার, যে অধিকার কেবল সম্প্রদায়ে অপরের সাথে চর্চা করা যায়। এসব অধিকারের সারমর্ম হলো সম্প্রদায়ে, বিশেষভাবে রাজনৈতিক *সম্প্রদায়ে, রাষ্ট্রজীবনে অংশগ্রহণ*। এগুলো রাজনৈতিক মুক্তি, নাগরিক অধিকারের বর্গের আওতাভুক্ত। আমরা দেখেছি, এগুলো কোনোভাবেই তর্কাতীত নয় এবং সদর্থকভাবে ধর্মের, তাই ইহুদিবাদেরও বিলুপ্তি ঘটানোর পূর্বানুমান দেয় না। তাহলে বাকি রইলো *মানব অধিকারের* বাকি অংশ—যেখানে *নাগরিক অধিকারের* সঙ্গে তা ভিন্ন, সেই অংশ পরীক্ষা করে দেখা।

এর মাঝে আছে বিবেকের স্বাধীনতা, পছন্দমতো যে কোনো ধর্মচর্চার অধিকার। *বিশ্বাসের সুবিধা* প্রকাশিতভাবেই চেনা যায়, হয় *মানব অধিকার* হিসেবে নয়তো মানব অধিকারের ফলাফল—মানে স্বাধীনতা হিসেবে।

মানব এবং নাগরিক অধিকারের ঘোষণা ১৭৯১, আর্টিকেল ১০: "কাউকেই তার মতামত, এমনকি ধর্মীয় মতামতের কারণেও বিভক্ত করা যাবে না।" "প্রতিটি মানুষের নিজ অনুসরণকৃত ধর্মাচারণের স্বাধীনতা" ১৭৯১-এর সংবিধানের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে মানব অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা আছে।

১৭৯৩-এর মানুষের অধিকারের ঘোষণা, আর্টিকেল-৭ মানুষের অধিকারসমূহের মধ্যে ধর্মের স্বাধীন চর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিন্তা ও মতামত প্রকাশ, মিলিত হওয়া এবং ধর্মচর্চার অধিকারের সাথে যুক্ত করে এমনকি এও বলা হচ্ছে "এসব অধিকার ঘোষণার আবশ্যিকতা স্বৈরতন্ত্রের উপস্থিতি কিংবা নিকট অতীতে তার অস্তিত্বের স্মৃতির পূর্বানুমান।" তুলনা করুন ১৭৯৫-এর সংবিধান শিরোনাম ১৪, আর্টিকেল ৩৫৪।

পেনিসিলভেনিয়ার সংবিধান, আর্টিকেল-৯ ও ৩: "প্রতিটি মানুষই প্রকৃতির কাছ হতে সর্বশক্তিমানকে তাদের বিবেকানুসারে আরাধনা করার অনির্দেশযোগ্য অধিকার পেয়েছে। কাউকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ধর্মের বা ধর্মতন্ত্রের অনুসরণ করতে বা সমর্থন করতে আইনগতভাবে বাধ্য করানো যাবে না। কোনো অবস্থায়-ই মানব কর্তৃত্ব বিবেকের প্রশ্নে এবং অন্তরাত্মার শক্তি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

আর্টিকেল ৫ ও ৬, নিউ হ্যাম্পশায়ার সংবিধান: "এসব স্বাভাবিক অধিকারসমূহের মাঝে কিছু তাদের নিজ গুণেই বিচ্ছিন্ন হবার নয়, কারণ এগুলো প্রতিস্থাপনযোগ্য নয়। বিবেকের অধিকার তার মাঝে একটি।"

মানব অধিকার এবং ধর্মের বেমানান সম্পর্ক মানুষের অধিকার ধারণায় এতই অনুপস্থিত যে, যার যেমন ইচ্ছে *ধার্মিক হওয়ার অধিকার* এবং পছন্দসই ধর্মচর্চার অধিকার—মানুষের অধিকারসমূহের মাঝে খোলামেলাভাবে যুক্ত হয়েছে। *বিশ্বাসের সুবিধা* হচ্ছে *মানুষের সার্বজনীন অধিকার*।

এসব *মানব অধিকার* যেমনটা আছে তা *নাগরিক অধিকার* থেকে আলাদা। *নাগরিক* থেকে আলাদা এই *মানুষটি কে? সিভিল সমাজের সদস্য* ছাড়া অন্য কেউ নয়। কেন সিভিল সমাজের সদস্যকে 'মানুষ', স্রেফ মানুষ বলা হলো, কেন তার অধিকারকে বলা হলো *মানব অধিকার?* ব্যাপারটা কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায়? ব্যাখ্যা করা যায় রাজনৈতিক মুক্তির প্রকৃতি এবং সিভিল সমাজের সাথে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক থেকে।

সর্বোপরি এই সত্যকে আমরা স্মরণে রাখি যে, মানব অধিকার, নাগরিক অধিকার হতে বিচ্ছিন্ন তথাকথিত মানব অধিকার হলো সোজা কথায় *সিভিল সমাজের সদস্যের* অধিকার, মানে অহংবাদী, অপর মানুষ আর সম্প্রদায় হতে আলাদা হওয়া মানুষের অধিকার। চলুন শুনি, ১৭৯৩ সালের সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল সংবিধানের এক্ষেত্রে কি বলার আছে:

নাগরিক এবং মানব অধিকারের ঘোষণা আর্টিকেল ২, 'এসব অধিকার, ইত্যাদি (স্বাভাবিক এবং অনির্দেশযোগ্য অধিকার) হলো: সাম্য, মুক্তি, নিরাপত্তা এবং সম্পত্তি।'

মুক্তি কি?

আর্টিকেল ৬, 'মুক্তি হলো মানুষের অপরের অধিকার খর্ব না করা যে

> কোনো কাজ করবার ক্ষমতা', অথবা ১৭৯১-এর মানুষের অধিকার ঘোষণা অনুসারে: 'অপরের ক্ষতি করে না এমন যে কোনো কাজ করবার সামর্থ্যই মুক্তি।'

মুক্তি তাহলে *অপরের ক্ষতি* না করে সবকিছু করবার, সম্পাদন করার অধিকার। *অপরের ক্ষতি* না করে ব্যক্তির নড়াচড়ার সীমা বেঁধে দেয়া হয় আইন দিয়ে, ঠিক যেমন দুই মাঠের চৌহদ্দি ঠিক করা হয় খুঁটি পুঁতে। মুক্ত মানুষ হচ্ছে এখানে নিজের মাঝে গুটিয়ে যাওয়া বিচ্ছিন্ন একক মানুষ। বাউয়ের কেন বলেন যে, ইহুদিরা মানব অধিকার অর্জনে সমর্থ নয়?

> যতক্ষণ সে ইহুদি, তাকে ইহুদি করে তোলা ধরাবাঁধা স্বভাব অবশ্যই ছাপিয়ে যাবে মানুষের স্বভাবকে যা কিনা মানুস হিসেবে তাকে অন্য মানুষের সাথে যুক্ত করে, এবং তাকে আলাদা করে অ-ইহুদিদের থেকে।

কিন্তু মানুষের মুক্তির এই অধিকার তো মানুষের সাথে মানুষের বন্ধনের ভিত্তিতে নয় বরং মানুষ থেকে মানুষে আলাদা হওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এটা হলো সেই আলাদা হওয়ার অধিকার, নিজের মাঝেই নিজে গুটিয়ে যাওয়া *ধরাবাঁধা* ব্যক্তির অধিকার।

ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানব মুক্তির অধিকার হলো *ব্যক্তিসম্পত্তিতে* মানুষের অধিকার।

ব্যক্তিসম্পত্তিতে মানব অধিকার কি?

> আর্টিকেল ১৬ (১৭৯৩-এর সংবিধান): '*সম্পত্তির* অধিকার হলো প্রতিটি নাগরিকের *ইচ্ছা অনুযায়ী* তার মালামালের, আয়ের এবং তার কাজ ও শ্রমের ফল ভোগ বা হস্তান্তর।'

ব্যক্তিসম্পত্তিতে মানুষের অধিকার তাহলে কারোর নিজের ইচ্ছায় নিজের সম্পদ, অপর মানুষের তোয়াক্কা না করে এবং সমাজ হতে স্বাধীনভাবে ভোগ বা হস্তান্তরের অধিকার, মানে আত্মস্বার্থের অধিকার। এই ব্যক্তি স্বাধীনতা আর তার প্রয়োগই সিভিল সমাজের ভিত্তি গঠন করে। এটা প্রত্যেক মানুষকে অপর মানুষের মাঝে নিজের স্বাধীনতার *বাস্তবায়ন* দেখায় না, বরং দেখায় *প্রতিবন্ধকতা*। কিন্তু সর্বোপরি তা মানব অধিকারের ঘোষণা দেয়:

'প্রতিটি নাগরিকের ইচ্ছা অনুযায়ী তার মালামালের আয়ের এবং তার কাজ এবং শ্রমের ভোগ বা হস্তান্তরে'র ঘোষণা দেয়।

বাকি রইলো মানুষের আর দুটি অধিকার: *সাম্য* ও *নিরাপত্তা*।

অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এখানে ব্যবহার করা *সাম্যের* মানে উপরে বর্ণিত *মুক্তির* সাম্য ছাড়া কিছু নয়—মানে, প্রতিটি মানুষ স্ব-সম্পূর্ণ একক হিসেবে সমান মাত্রায় বিবেচিত হবে। ১৭৯৫-এর সংবিধান এই সাম্যের ধারণাকে তার উপরোক্ত তাৎপর্য অনুসারেই সংজ্ঞায়িত করে এভাবে:

আর্টিকেল ৩ (১৭৯৫-এর সংবিধান): "রক্ষা বা শাস্তি প্রদান যাই করুক সবার জন্য আইন সমান—এই হলো সাম্য।"

আর *নিরাপত্তা?*

আর্টিকেল ৮ (১৭৯৩-এর সংবিধান): "সমাজের প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিত্ব, অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষার সামর্থ্য বিধান হলো নিরাপত্তা।"

নিরাপত্তা হলো সিভিল সমাজের সর্বোচ্চ সামাজিক ধারণা, মানে *পুলিশের* ধারণা, যার মাধ্যমে এই ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায় যে, পুরো সমাজটি টিকে আছে কেবল তার প্রত্যেক সদস্যকে তার ব্যক্তিত্ব, অধিকার ও সম্পত্তি রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য। এই দৃষ্টিতেই হেগেল সিভিল সমাজকে বলেন, 'অভাব ও যুক্তির রাষ্ট্র।'

নিরাপত্তার ধারণা সিভিল সমাজকে তার অহংবাদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় না। বরং নিরাপত্তা হলো তার *অহংবাদের নিশ্চয়তা*।

তথাকথিত মানব অধিকারের কোনোটিই তাই অহংসর্বস্ব মানুষকে, সিভিল সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষকে, মানে যে মানুষ নিজের মাঝে গুটিয়ে আসা, নিজের ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যক্তি লোভের গরাদে আটকা পড়া, তার সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মানুষ তাকে ছাপিয়ে যায় না। মানব অধিকারের সীমায় তাকে প্রজাতি সত্ত্বা হিসেবে চিন্তাই করা যায় না; বরং ব্যক্তির কাছে খোদ প্রজাতি-জীবন ও সমাজ হাজির হয় তার আসল স্বাধীনতার পথে বাধাস্বরূপ বহিস্থ এক কাঠামো হিসেবে। তাদেরকে একত্রে ধরে রাখে একটি মাত্র বন্ধন—প্রাকৃতিক প্রয়োজন, অভাব ও ব্যক্তিস্বার্থ, তাদের সম্পত্তি এবং অহংসর্বস্ব সত্ত্বার সংরক্ষণ।

ব্যাপারটা যথেষ্ট ধাঁধায় ফেলে দেয়ার মতো যে, একটা জনগোষ্ঠী যে নিজের বিভিন্ন অংশের মাঝের সব বাধা ভেঙে চুরমার করে দিতে, রাজনৈতিক এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে সবে নিজেকে মুক্ত করা শুরু করলো, তারাই কিনা খুব পবিত্র ভাব নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের অন্য সদস্য এবং খোদ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন অহংসর্বস্ব মানুষের অধিকার (১৭৯১-এর ঘোষণা) ঘোষণা করলো, এবং বাস্তবিকই সেই ঘোষণা আবার পুনরাবৃত্তি করলো এমন সময় যখন জাতি নিজেকে রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বীরত্ব চাইছে, যখন সিভিল সমাজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন সময়ের দাবি, যখন সমস্ত অহংবাদিতা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য (মানব অধিকারের ঘোষণা ইত্যাদি, ১৭৯৩)! ব্যাপারটা আরো ধাঁধার মতো লাগে, যখন দেখি যে, রাজনৈতিক মুক্তিদাতারা নাগরিকত্ব এবং *রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে* এই সব তথাকথিত মানব অধিকার লালন-পালনের *হাতিয়ারে* সীমিত করে ফেলেন, সে কারণে *নাগরিকরা* ঘোষিত হন অহংসর্বস্ব *মানুষের* সেবক হিসেবে, যেখানে মানুষের সম্প্রদায়গত সত্ত্বা হিসেবে কাজ করবার বলয় নেমে আসে তার আংশিক সত্ত্বা কাজ করার বলয়ে, ফলে, শেষ পর্যন্ত মানুষ *নাগরিক* হিসেবে নয় বরং *বুর্জোয়া* হিসেবে বিবেচিত হয় *আবশ্যিক, সত্যিকারের* মানুষ বলে।

> সমস্ত *রাজনৈতিক সংঘের লক্ষ্য* হলো স্বাভাবিক এবং অনির্দেশযোগ্য মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করা। (১৭৯১-এর অধিকার ঘোষণা ইত্যাদি, আর্টিকেল ২)
> সরকার গঠিত হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক, অনির্দেশযোগ্য অধিকারের ভোগ নিশ্চিত করতে। (ঘোষণা, ১৭৯৩, আর্টিকেল ১)

তাই, এমন কি যখন তার উদ্দীপনায় থাকে যৌবনের সতেজতা, পারিপার্শিকতার শক্তি যখন তাকে চূড়ান্ত মাত্রায় একাগ্র করে তোলে, রাজনৈতিক জীবন নিজেকে ঘোষণা করে নিছক এক *উপায়* বলে, যার উদ্দেশ্য হলো সিভিল সমাজের জীবন। এ কথা সত্য যে, এর বিপ্লবী চর্চা তার নিজের তত্ত্বের সঙ্গে খোলাখুলি এক দুষ্টু দ্বন্দ্বে লিপ্ত। নিরাপত্তাকে যখন মানুষের একটি অধিকার বলে ঘোষণা করা হচ্ছে তখনই চিঠিপত্রের গোপনীয়তা লঙ্ঘন খোলাখুলিভাবে ঘোষিত হচ্ছে যুগের নিয়ম বলে। যখন মানুষের অধিকারের ফলাফল হিসেবে *'ছাপাখানার বাধাহীন স্বাধীনতা'*

(১৭৯৩-এর সংবিধান, আর্টিকেল ১২২) ব্যক্তি স্বাধীনতা হিসেবে নিশ্চিত করা হচ্ছে, তখনই ছাপাখানার স্বাধীনতা পুরোপুরি ধ্বংস করা হচ্ছে, কারণ

> "জন-স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়লে ছাপাখানার স্বাধীনতা অনুমোদন করা যায় না।" (Robespierre June; Histoire Perlementaire de la revolution francaise, Buchez এবং Roux রচিত, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা-১৫৯)।

অতএব, বলা যায় যে, স্বাধীনতার অধিকার যখনই *রাজনৈতিক জীবনের* সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তখনই তা আর অধিকার থাকে না, অথচ কিনা তত্ত্বে বলা হচ্ছে রাজনৈতিক জীবন সোজা কথায় মানুষের, স্বতন্ত্র মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা, যা তার লক্ষ্য মানে মানুষের এই সব অধিকারের সাথে দ্বন্দ্ব করলেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু চর্চা নিছক ব্যতিক্রম, তত্ত্বই নিয়ম। এমনকি বিপ্লবী চর্চাকে যদি কেউ সম্পর্কটির সঠিক প্রতিফলন বলে মেনেও নেয় তবু একটা ঝামেলা রয়ে যায়। কেন রাজনৈতিক মুক্তিদাতাদের মাথায় বিষয়টা উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে *লক্ষ্যকে* উপায় আর উপায়কে লক্ষ্য বলে মনে হয়? তাদের চেতনার এই দৃষ্টিবিভ্রম এখন মনোবৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক ধাঁধা হলেও, ধাঁধা হয়েই থাকবে।

ধাঁধাটির কিন্তু একটা সিধে সরল সমাধান আছে।

রাজনৈতিক মুক্তি একই কালে পুরনো সমাজের *মিলিয়ে যাওয়া*, যে সমাজের ওপর মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র, সার্বভৌমের ক্ষমতা ভর করে থাকে। রাজনৈতিক বিপ্লব হলো সিভিল সমাজের বিপ্লব। পুরাতন সমাজের চরিত্র কি ছিল? এক কথায় বললে—*সামন্তবাদ*। পুরাতন সিভিল সমাজের চরিত্র ছিল *সরাসরি রাজনৈতিক*, মানে সিভিল জীবনের উপাদান যেমন সম্পত্তি, পরিবার বা শ্রমের ধরনকে জমিদারী, তালুক বা গিল্ডের আঙ্গিকে রাজনৈতিক জীবনের উপাদানের পর্যায়ে তুলে আনা হয়েছিলো। এই আঙ্গিকে তারা *সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের* সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক যেমন তার *রাজনৈতিক* সম্পর্ক মানে সমাজের অপর উপাদান হতে তার আলাদা হওয়ার, বর্জনের সম্পর্ককে নির্ধারণ করতো। জাতীয় জীবনের আয়োজন সম্পত্তি বা শ্রমকে সামাজিক উপাদানের পর্যায়ে তুলে আনে নি বরং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার *বিচ্ছিন্নতা* সম্পূর্ণ করেছে এবং সংগঠিত করেছে সমাজের ভেতরে আরো *অনেক সমাজ* হিসেবে। এইভাবে সিভিল

সমাজের জীবনের কাজ ও শর্তাদি তখনো সামন্তঅর্থে হলেও রাজনৈতিকই ছিল, মানে, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র হতে ব্যক্তিকে তারা বাদ দিয়েছিলো এবং গিল্ডের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্ককে জাতির জীবনের সাথে তার সাধারণ সম্পর্কে পরিণত করেছিলো, ঠিক যেমন করে তার বিশেষ সিভিল কাজকর্ম ও পরিস্থিতিকে নিজের সাধারণ কাজকর্ম ও পরিস্থিতিতে বদল করে নিয়েছিলো। এই সংগঠনের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের ঐক্য, তার সাথে সেই ঐক্যের চৈতন্য, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া, রাষ্ট্রের সাধারণ ক্ষমতা একইভাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে জনগণ এবং তার কর্মচারিদের হতে বিচ্ছিন্ন কোনো শাসকের *বিশেষ কাজ-কারবার* বলে মনে হতে বাধ্য।

যে রাজনৈতিক বিপ্লব এই সার্বভৌম ক্ষমতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়কে জনগণের বিষয়ে পরিণত করেছে, যা রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে জনগণের ব্যাপার, মানে বাস্তব রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, তাকে আবশ্যিকভাবেই সমস্ত জমিদারি, গিল্ড, সংঘ এবং বিশেষ সুবিধা ভেঙে চুরমার করতে হয়েছে, কেননা সেগুলো ছিল সম্প্রদায় হতে মানুষের বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ। এভাবে রাজনৈতিক বিপ্লব *সিভিল সমাজের রাজনৈতিক চরিত্র উচ্ছেদ* করেছে। সে সিভিল সমাজকে টুকরো করেছে তার সরল অংশে; একদিকে ব্যক্তি, অপরদিকে ঐ সব ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও জীবন উপাদান গঠনকারী *বস্তু* ও *মরমী* উপাদান। সে সামন্ত সমাজের কানাগলিতে পথ হাতড়ে বেড়ানো, বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত রাজনৈতিক মরমকে মুক্তি দিয়েছে। সে রাজনৈতিক মরমের ছড়ানো-ছিটানো টুকরোগুলো একত্র করে, সিভিল জীবনের সাথে সেগুলোর তালগোল আলাদা করে একে সম্প্রদায়ের বলয় হিসেবে, সিভিল সমাজের ঐ সব *বিশেষ উপাদান* হতে আদর্শগতভাবে মুক্ত জাতির সাধারণ ব্যাপার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কোনো ব্যক্তির জীবনের *বিশেষ* কাজকর্ম এবং পরিস্থিতিকে নিছক ব্যক্তি বিশেষের তাৎপর্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সেগুলো আর রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সাধারণ সম্পর্ক গঠনকারীর ভূমিকায় রইলো না। জন-বিষয় অন্যদিকে হয়ে গেল প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বিষয়, আর রাজনৈতিক ক্রিয়া হয়ে গেল ব্যক্তির সাধারণ ক্রিয়া।

তবে রাষ্ট্রের এই ভাববাদ নিখুঁত করবার কাজটি একই সাথে ছিল সিভিল সমাজের বস্তুবাদের রূপায়ন। রাজনৈতিক জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার

মানে একই সাথে সিভিল সমাজের অহংসর্বস্ব মরমকে টেনে রাখে এমন বন্ধনগুলো ছুঁড়ে ফেলা। রাজনৈতিক মুক্তি ছিল একই সাথে সিভিল সমাজের রাজনীতি হতে, এমনকি কোনো *সার্বিক আধেয়র* নাম-গন্ধ হতে মুক্তি।

সামন্ত সমাজ তার মূল উপাদানে, মানে মানুষে পাল্টে গেল। কিন্তু যে *মানুষকে* দিয়ে সে তার ভিত্তি গড়লো সে হলো *অহংসর্বস্ব* মানুষ।

এমনি করে সিভিল সমাজের সদস্য এই মানুষ হলো *রাজনৈতিক* রাষ্ট্রের ভিত্তি, এর পূর্বশর্ত। মানব অধিকারের বিবেচনায় রাষ্ট্রের কাছে সে এমন স্বীকৃতিই পেল।

অহংসর্বস্ব মানুষের মুক্তি, এবং মুক্তির এই স্বীকৃতি বরং তার জীবন উপাদান গঠনকারী মরমী ও বস্তু উপাদানের *বাধাহীন* সঞ্চালনের স্বীকৃতি।

তাই, মানুষ ধর্ম হতে মুক্ত হতে পারলো না, পেল ধর্মীয় স্বাধীনতা। সে সম্পত্তি হতে মুক্তি পেল না, পেল সম্পত্তির মালিক হওয়ার স্বাধীনতা। পেল না ব্যবসার অহংবাদ হতে মুক্তি, পেল ব্যবসার স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং সিভিল সমাজের স্বনির্ভর *ব্যক্তিতে* অবলোপন (যারা কিনা আইনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত, ঠিক যেমন জমিদারী বা গিল্ডে মানুষ ছিল বিশেষ সুবিধা দিয়ে সম্পর্কযুক্ত) অর্জিত হয়েছে এক এবং অনুরূপ ক্রিয়া দিয়ে। সিভিল সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ অনিবার্যভাবে আবির্ভূত হয় অরাজনৈতিক, *প্রাকৃতিক মানুষ* হিসেবে। *মানুষের অধিকার* আবির্ভূত হয় *প্রাকৃতিক অধিকার* হিসেবে। কারণ সচেতন ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত হয় রাজনৈতিক ক্রিয়ার ওপর। অহংসর্বস্ব মানুষ অবলুপ্ত সমাজের পরোক্ষ ফল, এমন এক পরিণাম যা সোজাসাপ্টা কেবল *অস্তিতেই বিরাজমান*, এক *সমূহ নিশ্চিতি*-র বিষয় আর তাই এক *প্রাকৃতিক* বিষয়। রাজনৈতিক বিপ্লব সিভিল সমাজকে তার গঠনকারী উপাদানে আলাদা করে বের করে আনে ঐ সব উপাদানগুলোকে *বিপ্লবীকৃত* বা সমালোচনার বিষয় না করেই। এটি সিভিল সমাজ, প্রয়োজনের দুনিয়া, শ্রম, ব্যক্তিস্বার্থ, সিভিল আইনকে তার *অস্তিত্বের ভিত্তি* বলে গণ্য করে, গণ্য করে এমন এক *পূর্বশর্ত* হিসেবে যার জমিন আর ঠিকঠাক করবার দরকার নেই। আর তাই তা গৃহীত হয় এর *প্রাকৃতিক ভিত্তি* হিসেবে। শেষে, সিভিল সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষকে তার সংবেদনশীল, ব্যক্তি এবং সমূহ অস্তিত্বে, নাগরিক হতে সুস্পষ্টভাবে আলাদা মানুষ বলে গণ্য করা হয়। যেখানে কিনা রাজনৈতিক মানুষ কেবল

অমূর্ত, কৃত্রিম, এক উপমাবাচক, আইনি ব্যক্তি বলে গণ্য। বাস্তব মানুষ শুধু অহংসর্বস্ব স্বতন্ত্রের আঙ্গিকে আর *সত্যিকারের* মানুষ কেবল অমূর্ত নাগরিকের আঙ্গিকে স্বীকৃত হয়।

রুশো চমৎকারভাবেই রাজনৈতিক মানুষের এই অমূর্ত ভাব বর্ণনা করেছেন:

> জন-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়ার সাহস যেই দেখাক না কেন, তাকে অবশ্যই অনুভব করতে হবে যে নিজেকে তার *মানব স্বভাব বদলে* দেয়ার, প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে যে কিনা নিজেই এক সম্পূর্ণ এবং নিঃসঙ্গ সমগ্র তাকে বৃহৎ সমগ্রের অংশে (এক অর্থে যে সমগ্র হতে সে তার জীবন ও সত্ত্বা গ্রহণ করে) *রূপান্তরিত* করবার, সামষ্টিক ও নৈতিক/মানসিক অস্তিত্ব দিয়ে কেবল প্রকৃতিপ্রাপ্ত শারীরিক ও স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রতিস্থাপিত করবার সামর্থ্যসম্পন্ন বলে ভাবতে হবে। এককথায়, তাকে অবশ্যই মানুষের কাছ হতে তার নিজ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বিনিময়ে এমন বিজাতীয় ক্ষমতা দিতে হবে যা অপর মানুষের সহযোগিতা ছাড়া প্রয়োগ সম্ভব নয়। (J.J. Rousseau, Du Contrat Social, Book II, 1782. P-82)

সমস্ত মুক্তিই মানব জগত ও মানব সম্পর্কগুলোর *খোদ মানুষের* মাঝে সংকোচন।

রাজনৈতিক মুক্তি একদিকে সিভিল সমাজের সদস্যাতে, *অহংসর্বস্ব* স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিতে আর অপরদিকে *নাগরিকে*, আইনি ব্যক্তিতে মানুষের সংকোচন।

বাস্তব, ব্যক্তি মানুষ যখন তার নিজের মাঝে অমূর্ত নাগরিকটিকে আবার দখল করে নিতে পারবে, তার প্রাত্যহিক জীবনে, তার সব কাজে, সব পরিস্থিতিতে ব্যক্তি মানবসত্ত্বা হিসেবে সে যখন *প্রজাতি-সত্ত্বা* হয়ে উঠতে পারবে, যখন মানুষ তার *'নিজ ক্ষমতা' সামাজিক* ক্ষমতা হিসেবে চিনে নিতে, সংগঠিত করতে পারবে, আর তাই ফলস্বরূপ *রাজনৈতিক* ক্ষমতার আকারে আর নিজ হতে সমাজ ক্ষমতাকে আলাদা করবে না, কেবল তখনই মানব মুক্তি সম্পূর্ণ হবে।

২

ব্রুনো বাউয়ের, "বর্তমান দিনের ইহুদি এবং খ্রিষ্টানের স্বাধীন হওয়ার সামর্থ্য।" (পৃষ্ঠা-৫৬-৭১)

বাউয়ের এমনি আঙ্গিকে *ইহুদি* আর *খ্রিষ্টান ধর্ম* এবং একই সাথে সমালোচনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে কারবার করেন। সমালোচনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হলো "মুক্ত হওয়ার সামর্থ্যের সঙ্গে" সম্পর্ক।

এ থেকে ফলাফল যেখানে উপনীত হয়:

> মুক্ত হতে গেলে 'ধর্মকে একেবারে ত্যাগ করবার জন্য খ্রিষ্টানদের কেবল একটা বাধাই টপকাতে হবে, তা হলো তাদের ধর্ম'। 'অপরদিকে ইহুদিদের কেবল তার ইহুদিয়ানা স্বভাব ছেড়ে আসলেই হবে না, একই সাথে তার ধর্মকে সম্পূর্ণ করবার দিকে তার বিকাশ, যে বিকাশ তার কাছে বিজাতীয় তাও ছেড়ে আসতে হবে।' (পৃষ্ঠা-৭১)

এভাবে বাউয়ের ইহুদি মুক্তির সমস্যাটিকে আগাগোড়া ধর্মীয় সমস্যা বানিয়ে ফেলেন। ইহুদি আর খ্রিষ্টানের মাঝে কার নাজাত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি—এই পুরাতন ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নটিকেই আলোকিত রূপে আবার পেশ করা হলো: তাদের মধ্যে *কে মুক্ত হতে বেশি সক্ষম*। প্রশ্নটি আর এই নয় যে, ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান ধর্মই কি মানুষকে মুক্তি দেয়? প্রশ্নটি বরং এখন এরকম হয়ে গেল: ইহুদিয়ানা অথবা খ্রিষ্টানত্ব—কোনটির অস্বীকৃতি মানুষকে বেশি মুক্ত করে?

> "ইহুদি'রা যদি মুক্ত হতে চায়, তবে তাদের খ্রিষ্টানত্বে বিশ্বাস ঘোষণা করলে চলবে না, ঘোষণা করতে হবে খ্রিষ্টানত্ব এবং সাধারণভাবে ধর্মের অবলোপনে, মানে আলোকায়নে ও সমালোচনায় বিশ্বাস। যার ফল হচ্ছে মুক্ত মানবতার বিশ্বাস।" (পৃষ্ঠা-৭০)

ইহুদিদের জন্য এখনো তা এক *বিশ্বাস কবুল* করবার বিষয়, কিন্তু তা আর খ্রিষ্টানত্ব কবুল করবার নয়, খ্রিষ্টানত্ব'র অবলোপনে বিশ্বাস।

বাউয়ের ইহুদিদের কাছে খ্রিষ্টান ধর্মের সারসত্ত্বা ছেড়ে আসার দাবি জানান, যে দাবি তার নিজের মতেই ইহুদিবাদের বিকাশ হতে জন্মায়নি।

যেহেতু বাউয়ের তার *ইহুদি প্রশ্ন* রচনার শেষে ইহুদিবাদকে খ্রিষ্টানত্বের নিছক এক আকাট ধর্মীয় সমালোচনা হিসেবে বুঝেছেন, ফলত তার কাছে শুধু এর ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান, কাজে কাজেই বোঝাই যায়, ইহুদিদের মুক্তির ব্যাপারটিকেও তিনি দার্শনিক-ধর্মতাত্ত্বিক এক কাজ বানিয়ে ছাড়বেন।

বাউয়ের মনে করেন, ইহুদিদের অমূর্ত, *আদর্শ* স্বভাব, তাদের ধর্মই তাদের *সমগ্র* বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি সঠিকভাবেই উপসংহার টানেন যে:

> "ইহুদিরা যদি তাদের সংকীর্ণ আইন, সমগ্র ইহুদিবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তবু তাতে মানবজাতির সামান্য কিছুও পাওয়া হয় না।" (পৃষ্ঠা-৬৫)

একইভাবে ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের মাঝের সম্পর্ক যা দাঁড়ায় তা হলো: ইহুদিদের মুক্তিতে খ্রিষ্টানদের একমাত্র স্বার্থ হলো সাধারণ মানবিক এক *তাত্ত্বিক* স্বার্থ। ইহুদিবাদ এমন এক ব্যাপার, যা খ্রিষ্টানদের ধার্মিক চোখে বালির মতো যন্ত্রণা দেয়। তাদের চোখ আর ধার্মিক না থাকলে ব্যাপারটাও আর ঝামেলাজনক থাকে না। মোদ্দা কথা, ইহুদিদের মুক্তিতে খ্রিষ্টানদের কিছু করবার নেই।

অপরদিকে নিজেদের মুক্ত করবার খাতিরে ইহুদিদের শুধু নিজের কাজটা সারলেই চলবে না। তার সঙ্গে খ্রিষ্টানদের কাজও শেষ করতে হবে (মানে *যীশুর জীবন* এবং সিনোপেটিক ইতিহাসের পর্যালোচনা, ইত্যাদি)।

> "এটা তাদের নিজেদেরই মোকাবেলা করতে হবে, তাদের ভাগ্য তাদেরই নির্ধারণ করতে হবে; কিন্তু ইতিহাস নিয়ে তো ছেলেখেলা করা যায় না।" (পৃষ্ঠা ৭১)

আমরা চেষ্টা করছি সমস্যাটির ধর্মতাত্ত্বিক সূত্রায়নটা ভেঙে বের হয়ে আসতে। আমাদের জন্য ইহুদিদের মুক্তি অর্জনের সামর্থ্যের প্রশ্নটা যে প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়েছে তা হলো: ইহুদিবাদ নিশ্চিহ্ন করতে হলে কোন বিশেষ *সামাজিক* উপাদান অতিক্রম করতে হবে? কারণ মুক্তির জন্য আজকের দিনের ইহুদিদের সামর্থ্য হলো আজকের দুনিয়ার মুক্তির সঙ্গে ইহুদিবাদের

সম্পর্ক। এই সম্পর্ক অনিবার্যভাবেই প্রবাহিত হয় আজকের শৃঙ্খলিত দুনিয়ার মাঝে ইহুদিদের নির্দিষ্ট অবস্থান হতে।

বাউয়ের-এর মতো *কাঠমোল্লা ইহুদিদের* না নিয়ে জাগতিক, *প্রতিদিনের ইহুদি* নিয়ে আলোচনা চালানো যাক।

ইহুদিদের রহস্য তার ধর্মের মাঝে না খুঁজে বরং বাস্তব ইহুদিদের মাঝে তার ধর্মের রহস্য খোঁজা যাক।

ইহুদিবাদের জাগতিক ভিত্তি কি? ব্যবহারিক প্রয়োজন, *আত্মস্বার্থ*।

ইহুদিদের জাগতিক ধর্ম কি? *ফেরিবাজি*। তার জাগতিক ঈশ্বর কে? *টাকা*।

বেশ! তাহলে ফেরিবাজি আর টাকা হতে মুক্তি, ফলে ব্যবহারিক, বাস্তব ইহুদিবাদ হতে মুক্তিই হবে আমাদের কালের আত্মমুক্তি।

ফেরিবাজি, ফেরিবাজির সম্ভাবনা যে ভিত্তির ওপর টিকে থাকে—সেই ভিত্তি নিশ্চিহ্ন করতে পারে এমন সামাজিক গঠন তৈরি করলে ইহুদি হওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে। তার ধর্মীয় চৈতন্য এক অরুচিকর আবরণের মতো সমাজের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। অন্যদিকে, যদি ইহুদিরা বুঝতে পারে যে তার এই ব্যবহারিক স্বভাব চরিত্র অকাজের, এবং তা নিশ্চিহ্ন করতে সে কাজ করে, তাহলে সে তার আগের বিকাশের ধারা হতে সরে এসে প্রকৃত অর্থে *মানব মুক্তির* পক্ষে কাজ করবে, মানব আত্ম-বিচ্ছিন্নতার *চূড়ান্ত ব্যবহারিক* প্রকাশের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে।

আমরা তাই ইহুদিবাদের মাঝে বর্তমান কালের এক সার্বিক ও সাধারণ *সমাজবিরোধী* উপাদান চিহ্নিত করি, যে ক্ষতিকর উপাদানকে ঐতিহাসিক বিকাশের মাঝ দিয়ে যেখানে ইহুদিরাও আগ্রহভরে অবদান রেখেছে, তার বর্তমান চূড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে, অবশ্যই তা এখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শুরু হওয়া দরকার।

শেষ বিচারে *ইহুদিদের মুক্তি হচ্ছে ইহুদিবাদ* হতে মানবজাতির মুক্তি।

ইহুদিরা ইতোমধ্যেই ইহুদিয়ানা তরিকায় নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে।

> "যে ইহুদিদের ভিয়েনাতে একমাত্র সহ্য করা হয়, তারা গোটা সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে তার আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে। যে ইহুদির হয়তো জার্মানির সবচেয়ে ছোট রাজ্যেও কোনো অধিকার নেই সে ভাগ্য নির্ধারণ করে ইউরোপের। গিল্ড বা কর্পোরেশনগুলো যখন তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বা তখনও পর্যন্ত সুনজরে দেখে না, তখন শিল্পকারখানার চিতিয়ে

রাখা বুক মধ্যযুগীয় সংগঠনগুলোর একগুয়েমিকে পরিহাস করে। (ইহুদি প্রশ্ন, পৃষ্ঠা-১১৪)

ঘটনাটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ইহুদিরা ইহুদিয়ানা তরিকায় নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে তা শুধু আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করেই নয়, একই সাথে এর কারণ হচ্ছে—তার মাধ্যমে তো বটেই, তার বাইরেও *টাকা* এখন বিশ্বশক্তি হয়ে গেছে, আর ব্যবহারিক ইহুদির মরম হয়ে গেছে খ্রিষ্টান জনগণের ব্যবহারিক মরম। খ্রিষ্টানরা যতটুকু ইহুদি হয়েছে ইহুদিরাও ততটুকু নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

যেমন, কাপ্তান হ্যামিলটন জানান:

"ধর্মভীরু এবং রাজনৈতিকভাবে মুক্ত নিউ ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা যেন সাপের চোখে তাকিয়ে সম্মোহিত হয়ে আছে। যে সাপ তাদের পিষে ফেলছে তার থেকে ছাড়া পেতে তাদের বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। কুবের তার দেবতা, যাকে সে কেবল তার মুখ দিয়ে নয়, তার দেহ-মনের সর্বশক্তি দিয়ে উপাসনা করে। দুনিয়া তার কাছে স্টক এক্সচেঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়, প্রতিবেশীর চাইতে বেশি ধনী হওয়া ছাড়া দুনিয়াতে তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। বাণিজ্যের ভূত তাকে এমনভাবে আছর করেছে যে, সে লেনদেন করা ছাড়া বিশ্রাম পায় না। বেড়াতে গেলে সে যেন দোকান, ক্যাশ বাক্স কাঁধে নিয়ে বের হয়, লাভ-মুনাফা ছাড়া তার আর কোনো কথা নেই। যদি সে ক্ষণিকের জন্যও নিজের ব্যবসা থেকে চোখ সরায় তার একমাত্র কারণ অন্যের ব্যবসায় নাক গলানো। (বিউমঁ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৫-১৮৬)

আদতেই উত্তর আমেরিকায় খ্রিষ্টান জগতের ওপর ইহুদিবাদের দাপটের চেহারা এত সোজাসাপ্টা পরিষ্কার, এত স্বাভাবিক যে, খ্রিষ্টীয় মন্ত্রণালয় এবং খোদ *সুসমাচারের ওয়াজ নসিহতই* হয়ে গেছে বাণিজ্যের বিষয়। দেউলিয়া ব্যবসায়ী গিয়ে চার্চের পুরুত হয়, যেমন সফল পুরুত গিয়ে ঢোকে ব্যবসায়।

"যে সম্মানিত পুরোহিতকে দেখতে পাচ্ছো একেবারে সামনে, তিনি শুরুতে ছিলেন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায় লালবাতি জ্বললো, তিনি হয়ে গেলেন পুরুত। অন্যরা ছিলেন পুরোহিত। কিছু টাকা হাতে জমতেই সব ছেড়ে তিনি ব্যবসা শুরু করলেন। ধর্মীয় মন্ত্রণালয় বহু লোকের কাছেই বেশ ভালো একটা পেশা।" (বিউমঁ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৬)

বাউয়ের দৃষ্টিতে এ এক:

"আজগুবি কায়-কারবার। তত্ত্বে ইহুদিরা রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত, কিন্তু

বাস্তবে তার ক্ষমতা বিশাল। বৃহত্তর বলয়ে যে তাকে ব্যক্তি বলে মানে না তার ওপরেই সে রাজনৈতিক প্রভাব খাটায়। (বাউয়ের, ইহুদি প্রশ্ন, পৃষ্ঠা ১১৪)

ইহুদিদের ব্যবহারিক রাজনৈতিক ক্ষমতা আর তার রাজনৈতিক অধিকারের দ্বন্দ্ব হলো রাজনীতি আর সাধারণ আর্থিক ক্ষমতার মাঝের দ্বন্দ্ব। যদিও তাত্ত্বিকভাবে রাজনীতি আর্থিক ক্ষমতার চাইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বাস্তবে সে তার দাস।

ইহুদিবাদ শুধু খ্রিষ্টানত্বের পর্যালোচনা আর তার উৎস সম্পর্কে সন্দেহের এক মূর্ত রূপ হিসেবেই তার *পাশাপাশি* চলেছে এমন নয়। তার আরো কারণ হচ্ছে ব্যবহারিক ইহুদি মরম—মানে ইহুদিবাদ খ্রিষ্টান সমাজেই টিকে থেকেছে, এমন কি সেখানেই তার বিকাশের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছে। সিভিল সমাজের বিচ্ছিন্ন সদস্য যে ইহুদি, সে কেবল সিভিল সমাজের নির্দিষ্ট ইহুদিয়ানারই প্রকাশ।

ইহুদিবাদ ইতিহাসের বিরোধ হিসেবে নয় বরং ইতিহাসকে অবলম্বন করেই টিকে আছে ।

সিভিল সমাজ তার নাড়িভুড়ি হতেই বিরামহীনভাবে ইহুদি জন্ম দেয়।

ইহুদি ধর্মের নিজের ভিত্তি কি ছিল? ব্যবহারিক প্রয়োজন, আত্মপরায়ণতা।

ইহুদি একত্ববাদ তাই বাস্তবে বহু প্রয়োজনের বহুত্ববাদ, যে বহুত্ববাদ এমন কি হাতমুখ ধোয়ার জায়গাকেও শরিয়তের বিষয় করে ফেলে। **ব্যবহারিক প্রয়োজন, আত্মপরায়ণতা** *সিভিল সমাজেরই* নীতি, আর তা নিখাদভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যখন সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। *ব্যবহারিক প্রয়োজন* আর *আত্ম-স্বার্থের* দেবতা হলো *টাকা*।

টাকা হলো ইসরাইলের হিংসুক ঈশ্বর, সে আর কোনো দেবতাকে সহ্য করে না। টাকা মানুষের আর সব দেবতার জাত নষ্ট করে তাকে বাজারের মাল বানিয়ে ছাড়ে। টাকা হলো সব জিনিসের সার্বিক, স্বপ্রতিষ্ঠিত *মূল্য*। ফলে সে মানুষ আর প্রকৃতি, উভয় জগতেরই বিশেষ মূল্য লুট করে নিয়েছে। টাকা হলো মানুষের কাজ আর অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নকৃত সারসত্ত্বা। এই বিজাতীয় সারসত্ত্বা তাকে শাসন করে, আর সে তারই পূজা করে যায়।

ইহুদিদের দেবতা ইহজাগতিক হয়ে গেছে, বনে গেছে পৃথিবীর ঈশ্বর। বিনিময় বিল হচ্ছে ইহুদিদের সত্যিকারের দেবতা। তার দেবতা এক মায়াবী বিনিময় বিল ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্যক্তিসম্পত্তি আর টাকার রাজত্বে প্রকৃতি নিয়ে যে ধারণা দাঁড়িয়েছে তাতে প্রকৃতির অবমাননা আর দুর্গতির শেষ নেই। ইহুদি ধর্মে প্রকৃতি আছে, তবে তা কেবল কল্পনায় বিরাজ করে।

এই জায়গা থেকেই (১৫২৪ সালের একটি পুস্তিকায়) টমাস ম্যুনৎসেরের কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল যে,

> "সমস্ত জীবজন্তুও সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, জলের মাছ, আকাশের পাখি, মাটির ওপর গাছ; সমস্ত প্রাণশীল অস্তিত্বকেও অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।"

ইহুদি ধর্মে যা অমূর্ত রূপে উপস্থিত (তত্ত্ব, শিল্প, ইতিহাস, মানুষের জন্য মানুষ—এসবের প্রতি বিতৃষ্ণা) তাই টাকাওয়ালা মানুষের *বাস্তব, সচেতন* অবস্থান, তার গুণ। খোদ প্রজাতি সম্পর্ক, নর-নারীর মাঝের সম্পর্কও বাণিজ্যের বিষয় হয়ে যায়! ফলে নারীও পরিণত হয় বেচা-কেনার সামগ্রীতে।

ইহুদিদের *কিম্ভূত* জাতীয়তা বেনিয়াদের, সাধারণভাবে টাকাওয়ালাদের জাতীয়তা।

ইহুদিদের ভিত্তিহীন আইন কেবল আত্মস্বার্থে নিজেকে ঘিরে রাখা নিখুঁত *কেতাবি* আচার-অনুষ্ঠানের, সাধারণভাবে ভিত্তিহীন নৈতিকতা আর অধিকারের ধর্মীয় সঙ মাত্র।

এখানেও মানুষের চূড়ান্ত সম্পর্ক *আইনি* ব্যাপার মাত্র, আর এই আইনের সাথে তার সম্পর্কের গ্রাহ্যতা আইনগুলো তার নিজ ইচ্ছা আর স্বভাবের সাথে যায় বলে মোটেই তা নয়, বরং এই কারণে যে এগুলো *দাপুটে আইন*, আর তার বাইরে গেলে *প্রতিশোধের শিকার* হতে হবে।

বাউয়ের তালমুদে যে ইহুদি যেসুইট'পনা খুঁজে পান, সেই ব্যবহারিক যেসুইট'পনাই আসলে দুনিয়াকে দাবিয়ে রাখা আইনের সাথে খোদ-গরজি দুনিয়ার সম্পর্ক, যেসব আইনকে ধূর্ততার সাথে লঙ্ঘন করাই এই জগতের সবচেয়ে বড় শিল্প।

আদতেই এই আইনি ছকের মাঝে এই দুনিয়ার চলাফেরা মানে ক্রমাগত ঐ আইনকেই বুড়ো আঙ্গুল দেখানো।

ইহুদিবাদ ধর্ম হিসেবে, তাত্ত্বিকভাবে আর বিকাশ লাভ করতে পারেনি, কারণ ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিশ্ববীক্ষা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, দু'চার ঝাপটাতেই তা শেষ হয়ে যায়।

ব্যবহারিক প্রয়োজনের ধর্ম স্বভাববশেই তত্ত্বে নয়, *প্রয়োগে* তার পূর্ণতা পায়, এর কারণ সোজা কথায় প্রয়োগই হলো তার আসল সত্য।

ইহুদিবাদ নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি; সে কেবল তার নিজ ক্রিয়াকর্মের চৌহদ্দিতে জগতের নতুন সৃষ্টি এবং শর্তসমূহকেই জড়ো করতে পারতো। কারণ আত্মস্বার্থই যার যুক্তি সেই ব্যবহারিক প্রয়োজন হচ্ছে আসলে পরোক্ষ এক ব্যাপার, সে নিজ পছন্দমতো দিকে নিজেকে বাড়াতে অক্ষম, কিন্তু খোদ সমাজ শর্তের ক্রমাগত বিকাশের দাগ ধরেই তা বাড়তে থাকে।

সিভিল সমাজের সম্পূর্ণতার সাথেই ইহুদিবাদ তার শিখরে পৌঁছে, কিন্তু কেবলমাত্র *খ্রিষ্টান* জগতেই সিভিল সমাজ নিখুঁত হয়েছে। আসলে কেবল খ্রিষ্টানত্বের আধিপত্যেরকালেই (যা সব জাতিগত, স্বভাবগত, নীতিগত এবং তত্ত্বগত শর্তগুলোকে মানুষের কাছে বাহ্যিক করে দেয়) সিভিল সমাজ রাষ্ট্রজীবন হতে পুরোপুরি নিজেকে মুক্ত করে, মানুষের সমস্ত প্রজাতি বন্ধন ছিন্ন করে তার জায়গায় এনেছে অহংবাদ আর স্বার্থপর প্রয়োজনকে এবং মানব জগতকে অবলুপ্ত করেছে একে অপরের সাথে দুশমনের মতো লড়তে থাকা টুকরো মানুষের জগতে।

খ্রিষ্টানত্ব জন্ম নিলো ইহুদিবাদ হতে। সে আবার ইহুদিবাদেই মিলিয়ে গেল।

শুরু থেকে খ্রিষ্টানরা ছিল তত্ত্ব করা ইহুদি, ইহুদিরা তাই ছিল হাতে-কলমের খ্রিষ্টান আর হাতে-কলমের খ্রিষ্টান আর একবার ইহুদি হয়ে গেল।

খ্রিষ্টানত্ব বাস্তব ইহুদিবাদ অতিক্রম করেছে কেবল ছায়ায়। সে এতই মহৎ, এতই মরমী যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের স্থূলতা বিনাশ করতে গিয়ে সেই প্রয়োজন আসমানে তুলে দেয়া ছাড়া তার করবার কিছু ছিল না।

খ্রিষ্টানত্ব হচ্ছে ইহুদিবাদের মহিমান্বিত চিন্তা, আর ইহুদিবাদ হচ্ছে খ্রিষ্টানত্বের সাধারণ ব্যবহারিক প্রয়োগ, কিন্তু এই প্রয়োগ সার্বিক হয়ে উঠতে পেরেছে কেবলমাত্র তখনই যখন একটি বিকশিত ধর্ম হিসেবে খ্রিষ্টানত্ব প্রকৃতি এবং খোদ নিজের কাছ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে তত্ত্বগতভাবে সম্পন্ন করেছে।

একমাত্র তখনই ইহুদিবাদ সার্বিক আধিপত্য অর্জন করতে পারল আর পাল্টে ফেললো বিজাতীয়কৃত মানুষ ও প্রকৃতিকে বিজাতীয়যোগ্য, বিক্রয়যোগ্য বিষয়ে, যা কিনা আসলে অহংবাদী প্রয়োজন আর বাজারেরই দাস ।

বেচা-বিক্রি হলো বিজাতীয়তার ব্যবহারিক দিক। যেমন মানুষ যতক্ষণ ধর্মের খপ্পরে থাকে, ততক্ষণ সে তার আবশ্যিক স্বভাবকে বিষয়কৃত করতে পারে শুধুমাত্র সেটিকে এক *বিজাতীয়*, কাল্পনিক সত্ত্বায় পর্যবসিত করে। একইভাবে, অহংবাদী প্রয়োজনের অধীনে থাকলে সে তার কাজ, তার উৎপন্নকে এক বিজাতীয় সত্ত্বার অধীনে এনে, তার ওপর এক বিজাতীয় অস্তিত্বের তাৎপর্য আরোপ করেই কেবল নিজে বাস্তবে সক্রিয় হতে পারে। সেই বিজাতীয় সত্ত্বার নামই টাকা।

তার সর্বাধিক নিখুঁত চর্চায় বেহেশতি আশিষের খ্রিষ্টান অহংবাদ অবশ্যম্ভাবী রূপেই ইহুদিদের বস্তুগত আত্মসর্বস্বতায় পাল্টে যায়, বেহেশতি বাসনা বদলায় দুনিয়াবি অভাবে, বিষয়ীবাদ হয়ে যায় আত্মস্বার্থ। আমরা ইহুদিদের একগুঁয়েমি তার ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করি না, ব্যাখ্যা করি তার ধর্মের মানব ভিত্তি (বাস্তব প্রয়োজন, আত্ম-সর্বস্বতা) দিয়ে।

যেহেতু ইহুদিদের সত্যিকারের স্বভাব সার্বিকভাবে সিভিল সমাজে বাস্তবায়িত ও ইহজাগতিককৃত হয়েছে, ফলে সিভিল সমাজের পক্ষে তাকে তার *ধর্মীয়* স্বভাবের *অবাস্তবতা* বোঝানো সম্ভব নয় যে অবাস্তবতা আসলে কেবল বাস্তব প্রয়োজনেরই ভাবগত দিক। ফলে কেবল তাওরাত আর তালমুদেই নয়, হাল আমলের সমাজেও কোন বিমূর্ততা ছাড়াই একেবারে সর্বোচ্চ মাত্রার অভিজ্ঞতায় আধুনিক ইহুদির যে স্বভাব খুঁজে পাওয়া যায় , তা কেবল ইহুদিদের সংকীর্ণতা হিসেবে নয়, একই সাথে সমাজের ইহুদিয়ানা সংকীর্ণতা হিসেবেও।

একবার সমাজ ইহুদিবাদের *প্রয়োগবাদী* সারসত্ত্বা বিনাশ করতে সমর্থ হলে (মানে ফেরিবাজি ও তার পূর্বশর্তসমূহ) তখন ইহুদি হয়ে থাকাই হবে *অসম্ভব*। কারণ তার চৈতন্যের আর কোনো বিষয় থাকবে না, ইহুদিবাদের বিষয়ীগত ভিত্তি, বাস্তব প্রয়োজনগুলো তখন মানবিক হয়ে যাবে, ব্যক্তিক সংবেদনগত অস্তিত্ব এবং তার প্রজাতি-অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব নির্মূল হয়ে যাবে।

ইহুদিদের সামাজিক মুক্তি হলো *সমাজের ইহুদিবাদ হতে মুক্তি*।

পরিভাষা পরিচয়

নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমত মূল রচনায় বারবার ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো নেয়া হয়েছে। এই শব্দগুলোকে ঘিরেই মূলত লেখাটি আকার নিয়েছে। লক্ষ্য করবেন দার্শনিক পদগুলোর একটির ব্যাখ্যা আরো পদার্থের সাথে যুক্ত। ফলে মূল রচনাতে না থাকা কিছু পরিভাষা এই অংশের আপাত স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য গৃহীত হয়েছে। বর্ণনার সাথে মার্কস-এঙ্গেলসের মূল রচনাবলী হতে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। ইশতেহার ও হেগেলের অধিকার দর্শনের ভূমিকার উৎস রুশ সংস্করণ ও বাকিগুলোর ভাষান্তর সঙ্কলককৃত। বর্ণনার জন্য রোজেনথালের 'ডিকশনারি অব ফিলজফি', টম বটোমরের 'ডিকশনারি অব মার্কসিস্ট থট', মার্কসিস্ট আর্কাইভের 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব মার্কসিজম', উইকিপেডিয়া ইস্তেভান মাসযারেস, এরিক ফ্রমের লেখা এবং বিশেষত লেনিনের 'ফিলোজফিক্যাল' নোটবুকের ধারণা কাজে লাগানো হয়েছে। ধারণা জোড় লাগানোর দায় সঙ্কলকের। এই পরিভাষা-বর্ণনা সমন্বিত পাঠে অধিক কার্যকর হবে। প্রয়োজনমতো অগ্রসর পাঠ সাহায্যার্থে মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলীর প্রাসঙ্গিক অংশ নির্দেশ করা আছে। যেসব পরিভাষার বর্ণনা এই সঙ্কলনেই মজুদ তাতে নজরটান দেখবেন।

আধেয় এবং আঙ্গিক (Content and Form)

এই দুই দার্শনিক পদ কোনো জিনিসের *প্রতিভাস* (বা বৈশিষ্ট্য) এবং তার *সারসত্তা* বা অস্তিত্বের গড়মিল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আঙ্গিক হলো কোনো জিনিসের উপাদানের প্রকাশ বা ভেতরকার কাঠামো, তার অস্তিত্বের ধরন। অন্যদিকে আধেয় হলো ঐ জিনিসেরই যতরকম সম্ভাবনা এবং সম্পর্ক আছে তার যোগফল বা সমগ্রতা।

একসময় আধেয়কে ধারণা করা হতো অরূপ এক বস্তু আর আঙ্গিকে ঐ বস্তুর

কাঠামো হিসেবে। এমনি করে *বাস্তবতাকে* শুধু আঙ্গিক আর আধেয়কে একেবারে হাওয়াই সত্ত্বা বলে ধরলে সব বাস্তবতা অবাস্তব বা মায়া হয়ে যায়।

আধেয় এবং আঙ্গিক একই জিনিসের দুই প্রেক্ষিত। কোনো জিনিসের বিকাশ এবং চিনে নেয়ার প্রক্রিয়ায় এগুলো একে অপরের মাঝে ঢুকে পড়ে—মানে আঙ্গিক হয় আধেয় আর আধেয় হয়ে যায় আঙ্গিক।

আঙ্গিক ছাড়া আধেয় হয় না—কোনো জিনিস থাকলে তাকে কোনো না কোনো রূপে থাকতে হয়। আধেয় ছাড়া আঙ্গিক হয় না—কোনো জিনিসের যদি অন্য কিছুর সাথে সংযোগ থাকে তাহলে তা অন্য কিছুও হয়ে যেতে পারে।

কোনো কাহিনী চলচ্চিত্র হিসেবে বেশ নাম করলেও উপন্যাস হিসেবে ব্যর্থ হতে পারে, হতে পারে উল্টোটাও। শ্রেণী সংগ্রামে কোনো দ্বন্দ্ব সুসংগঠিত সংগঠনের আঙ্গিকে অর্থবহ ফলাফল আনতে পারে। অন্য কোনো দ্বন্দ্ব হয়তো একই আঙ্গিকে ব্যর্থ হবে। প্রাকৃতিক বা সামাজিক প্রক্রিয়াতে অসত্য আঙ্গিককে আধেয়'র কাছাকাছি বলে মনে হতে পারে, মনে হয় যেন আধেয় আঙ্গিকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাকে ছুঁড়ে ফেলে নতুন আঙ্গিক ধারণ করছে বা হয়ে উঠছে। উল্টোটাও হয়।

হেগেলের দার্শনিক পদ্ধতিতে আঙ্গিক ও আধেয়'র দ্বন্দ্ব প্রতিভাসে নেতিবাচক প্রেক্ষিত, যার মধ্য দিয়ে প্রতিভাস বাস্তবতা বলে প্রমাণিত হয়।

এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের 'লুডভিগ ফয়েরবাখের' চতুর্থ অংশ দেখুন।

ইতিবাচক এবং নেতিবাচক মুক্তি (Positive Freedom and Negetive Freedom)

নেতিবাচক মুক্তি বলতে বোঝায় কোনো স্বতন্ত্রের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার পথে ক্ষমতার ঘাটতি।

ইতিবাচক মুক্তি হলো ব্যক্তির পছন্দসই ক্রিয়া করবার পথ বেছে নেয়ার সামর্থ, নিজের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য সুযোগগুলোর বহাল থাকা।

এই প্রসঙ্গে দেখুন মার্ক্স-এঙ্গেলসের 'জর্মন ভাবাদর্শের ৩য় অধ্যায়, মার্ক্সের 'ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রামের ৪র্থ অধ্যায় ও 'অন ফ্রিডম অব দি প্রেস'।

কার্য ও কারণ (Cause & Effect)

প্রতিটি কাজের পেছনে কোনো কারণ থাকে, আবার সেই কারণগুলো কোনো না কোনো কাজ হতে জন্ম নেয়। প্রতিটি কার্যও তাই নিজেরই অস্তিত্বের শর্তগুলোর আংশিক কারণ। এই সম্পর্ক বুঝতে গিয়ে মানুষ ও জগতের সম্পর্ক একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র হিসেবে না বুঝলে সীমাবদ্ধতা উপস্থিত হয়। মার্ক্স এই সম্পর্ককে ক্রিয়াশীল মানুষের জগতের সম্পর্কের নিরিখে বুঝতে চাইতেন। ফলে ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তিতে গড়া বিচ্ছিন্নতায় মানব সমাজ সম্পর্ক মানুষ এবং জগতের মাঝে মধ্যস্থতা সৃষ্টি করে যা চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ কার্য-কারণ সম্পর্ক বোঝার পথে চরম প্রতিবন্ধকতা।

জর্মন-ফরাসি বর্ষপঞ্জি (Deutsh-Französische Jahrbücher)

রাইন গেজেট (Rheinische Zeitung) সেন্সরশিপের কবলে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই বর্ষপঞ্জি প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। তরুণ হেগেলিয়দের মাঝে তুমুল আলোড়ন শুরু হয় গেজেট বন্ধ হওয়ায়। অধিকাংশই কোন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে নিখাদ তত্ত্ব চর্চা শুরু করেন। মার্ক্স এবং আর্নল্ড রুগ এ পথে সম্মত না হয়ে বর্ষপঞ্জি প্রকাশের জন্য একত্রিত হন। পত্রিকাটি প্রথমে স্ট্রাসবুর্গ হতে প্রকাশের পরিকল্পনা থাকলেও তৎকালিন বিপ্লবী চিন্তার কেন্দ্র পারি হতে ১৮৪৪ এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ হয়। প্রথম সংখ্যার পরেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় মূলত দুটো কারণে-সেন্সরশিপের কারণে ফ্রান্স হতে জার্মানিতে গোপনে পত্রিকা বিলি করার ঝামেলা আর মার্ক্স ও রুগের মতবিরোধ।

জাতি (Nation)

সাধারণত মনে করা হয় জাতি হলো একই উৎস ভাষা, সংস্কৃতির, একই ভূখণ্ড, একই নিয়মনীতি মেনে চলা বড় কোনো জনগোষ্ঠী, যাদের অন্য জাতির কাছে স্বীকৃতি আছে। ঠিক করে বলতে গেলে, আসলে এ সবই আসলে জাতি যা নয় সে কথাগুলো বলছে। একই ভাষা সংস্কৃতি কোনো গোত্রও ধারণ করতে পারে যারা একই সীমানায় একই রকম নিয়মনীতি মেনে থাকতে পারে। আসলে জাতি হতে হলে গোত্রগত সংকীর্ণ নিয়মনীতি, একবগ্গা সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে বহুমুখীনতা ধারণ করবার ক্ষমতা থাকতে হবে। যেমন, ইসরাইলের মতো কোনো জাতিগত জনগোষ্ঠী পূর্ণ অর্থে জাতি হতে পারে না। যদি ফিলিস্তিন আর ইসরাইলিরা পরস্পরের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে বাস করা শুরু করতে পারে, তাহলেই কেবল ইসরাইলিরা গোত্রগত সংকীর্ণতা ভেঙে জাতি হয়ে ওঠার দিকে এগুতে পারবে। কোনো জনগোষ্ঠী সাধারণ আইন, ভাষা, সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও কুর্দিদের মতো নিজস্ব ভূমিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারার কারণে জাতি হয়ে উঠার প্রক্রিয়া সম্পন্ন নাও হতে পারে। আবার অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মতো নিজের ভূমিতে বহিরাগতদের অধীনস্ত হয়ে থাকার নজিরও পাওয়া যাবে। বলতে হয় এই জাতিসমূহের জাতিসত্ত্বা বাস্তবায়িত হয়নি।

একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূমিসীমার বাইরে কোনো জাতিকে অবশ্যই তার নাগরিকদেরকে নিরাপত্তা দিতে বা রক্ষা করতে হবে, এই অর্থে *সম্প্রদায়* ধারণাটি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমনকি জাতি-*রাষ্ট্রও* জাতির বিকাশের জন্য একটি অসম্পূর্ণতার লক্ষণ, কারণ রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়ের ভিতরে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মতো নিজের বহাল গঠন দিয়ে অসমাধানযোগ্য ঝামেলার স্বীকার হতে হয়। ফলে এই ধরনের সংঘাত মিলিয়ে না গেলে জাতি সবল হয় না। তবে এটা সম্ভব পুরো পৃথিবীজুড়ে শ্রেণী নামক বিভাজনটির মাত্রাগত পরিবর্তন হলে। ফলে কোনো পরিপূর্ণ বিকশিত জাতি মানুষের বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে মিলিয়ে যাবে, আদৌ আর জাতি থাকবে না।

এভাবে জাতি আসলে কোনো অনড় অস্তিত্ব নয়, প্রক্রিয়া।

জ্যাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jack Rosseau)

জন্ম ১৭১২, মৃত্যু ১৭৭৮। ফরাসি এনলাইটেনমেন্টের বামপন্থী ঘরানার দার্শনিক, ব্রহ্মবাদী, দ্বৈতবাদী (মন ও চিন্তা বিচারে), সংবেদনবাদী (সংবেদনই জ্ঞানের একমাত্র উৎস) তাঁর সামাজিক চুক্তি ও অসাম্যের উৎস নামক সামাজিক তত্ত্বের জন্য খ্যাত।

দিদেরো, ভলতেরের সাথে এনলাইটেনমেন্টের অংশীদার হয়ে ফরাসি বিপ্লবের ভিত তৈরি করেন। তাঁর কালের চৈতন্য ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিচারে যান্ত্রিক ধারণা ভেঙে বস্তুবাদী ভিত তৈরিতে তাঁর তীব্র সমাজ সমালোচনা খুবই প্রভাবক ছিল। 'মানুষের মাঝে অসাম্যের উৎস' রচনাতে তিনি দেখান, কেমন করে সামাজিক শর্তসমূহ, ব্যক্তিসম্পত্তি সামাজিক সব সমস্যা ও অসাম্য সৃষ্টি করে।

এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের *এন্টি ডুরিং*-এ তাঁর ওপরে মন্তব্য দেখুন।

টমাস ম্যুনৎসের (Thomas Muntzer)

জন্ম ১৪৮৯, মৃত্যু ১৫২৫। রিফর্মেশন জামানায় জর্মন ধর্ম প্রচারক, কৃষক যুদ্ধের বিদ্রোহী নেতা, প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারক। মার্টিন লুথারের সঙ্গে রিফর্মেশন আন্দোলনে যোগ দেন। ১৫২১ সালে লুথারকে জনস্বার্থবিরোধী, রাজা-বাদশার ধামাধরা বলে আলাদা তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ১৫২৫ সালে ৮০০০ কৃষক নিয়ে যুদ্ধে নেমে পরাজিত হন। তাঁর দ্বিখণ্ডিত দেহ জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়।

তিনি বলতেন, ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে আসা বন্ধ হয়নি। বাইবেল ব্যাখ্যা করেই তিনি কৃষকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন। এঙ্গেলস 'জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ' রচনায় তাঁকে বিপ্লবী নেতা বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ম্যুনৎসের বাইবেলের ভাষায় কথা বলতেন কারণ কৃষকরা এই ভাষাই বুঝতো।

টমাস হ্যামিলটন (Thomas Hamilton)

জন্ম ১৭৮৯, মৃত্যু ১৮৪২। ইংরাজ লেখক। ইংরাজ বাহিনীর হয়ে আমেরিকান যুদ্ধে অংশ নেয়ার পর সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। তাঁর ১৮৩৩-৩৪-এর *Man and Manners in America* গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য দলিল বলে স্বীকৃত, তবে নিজ দেশে এর জন্য তিনি নিন্দিত হন।

টাকা (Money)

টাকা হলো এমন এক পণ্য যার ব্যবহার হলো মূল্য সংরক্ষণ ও মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। তবে এই পণ্যটিকে অন্য সব পণ্যের সম্পর্কের হিসেবে বিশেষ এক ভূমিকা পালন করবার জন্য আলাদা করা হয়। ভূমিকাটি হলো—বাকি সব পণ্যের মূল্যের পরিমাপক হওয়া।

টাকা প্রথমে সার্বিকভাবে সবকিছুর সমান। মূল্য হিসেবে *বুর্জোয়া* সমাজে সবকিছুই টাকা দিয়ে পরিমাপযোগ্য। মূল্যের *আঙ্গিক* হিসেবে টাকা কাজ করলে মূল্য বিশেষ

ধাতুর *সারবস্তুর* আঙ্গিক গ্রহণ করে, যেমন—সোনা বা রূপা। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে টাকার আঙ্গিক বিকশিত হয়ে নিখাদ ভার্চুয়াল অস্তিত্ব পরিগ্রহ করে। তবে মার্কসের কালে কাগুজে টাকা ছিল মূল্যের অবিশ্বস্ত ধারক ও মাঝখানের সংরক্ষক, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে তখন ব্যবহৃত হতো সোনা-রূপা।

'পুঁজি'র প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে মার্কস মূল্যের আঙ্গিকের ঐতিহাসিক বিবর্তন তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগুজে টাকা ও মুদ্রা বাস্তবের চাইতে প্রথাগত মূল্য হিসেবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো। তবে কাগুজে টাকার মূল্যের প্রশ্নে তাকে ব্যবহারযোগ্য মূল্যে বদলে নেয়ায় বাস্তব ক্ষমতাটি বরাবরই মূল ব্যাপার ছিল।

বিংশ শতাব্দীতে রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মাধ্যম হিসেবে সোনার বদলে মার্কিন ডলার প্রতিস্থাপিত হয় ব্রেটন উডের ১৯৪৪-এর কনফারেন্সে। ১৯৬৮-৭৩ সালের দিকে ব্রেটন উড চুক্তি ভেঙে গেলে এক গতিশীল, ভার্চুয়াল অর্থ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

পুঁজির বিকাশের জন্য টাকার অস্তিত্ব একটি পূর্বশর্ত। তবে ব্যাপারটি শুরু হয় তখনই, যখন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রির অন্যকিছু থাকে না আর অপর শ্রেণীর কাছে থাকে ব্যক্তিসম্পত্তি হিসেবে উৎপাদনী মাধ্যমের মালিকানা। কেবল তখনই গাদা গাদা টাকা আবর্তনের মধ্যে এসে মুনাফা করে আর পুঁজি হয়ে উঠে।

যেহেতু মোট সামাজিক শ্রমের অনুপাত বাড়তে থাকে (তাকে আবার মানুষের অভাব পূরণ করার আগে অবশ্যই বিনিময় পদ্ধতির মাঝ দিয়ে আসতে হয়), যেহেতু *বাজার* (যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের অভাব প্রকাশ এবং পূরণ করে) জগৎব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে সেহেতু মূল্যের আঙ্গিক আবশ্যিকভাবেই ক্রমাগত বেশি করে হাওয়াই হয়ে উঠতে থাকে। কোনো কিছুর ওপর মূল্য আরোপের কাজটি একটা *হাওয়াই* কাজ, কারণ এতে ঐ জিনিসের সম্পূর্ণ নিরেট অস্তিত্ব হতে একটা নির্দিষ্ট গুণকেই কেবল আলাদা করে নেওয়া হয় মূল্য পরিমাপের স্বার্থে। একটা নির্দিষ্ট বস্তু, যেমন স্বর্ণের মধ্যে মূল্যের জমাটবদ্ধতা এই হাওয়াই করার এক বস্তুগত কাজ।

পণ্যকে প্রথমে আলাদা করা হয় মূল্য পরিমাপের কাজটুকু করতে। এটি আঞ্চলিক উৎপন্নের জন্য খুবই কার্যকরী। পরে অর্থপণ্যটি প্রান্তিকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তখনো তা পুরোমাত্রায় শ্রমেরই এক উৎপন্ন। অর্থপণ্যটির প্রেক্ষিত হতে এর বিকাশ মূল্যের এক হাওয়াই প্রতীক হয়ে উঠার কাহিনী। এটি একটি সামাজিক ক্যাটেগরি যা *সম্প্রদায়ের* মূল্যবোধকে প্রকাশ করে, যে মূল্যবোধ হাওয়াই শ্রমের অর্থপণ্যের প্রেক্ষিতটিকে ছাপিয়ে যায়।

আজকাল এই পরিবর্তন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আধুনিক জীবনের সমস্ত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সংরক্ষণ, পরিমাপ বা মূল্যের বাহক হিসেবে টাকা বা ক্রেডিট কার্ডের মতো অন্য কিছুই এত কার্যকরী নয়। মূল্যের এই বায়বীয়, হাওয়াই উত্তরণ আজকের যুগের শ্রমপ্রক্রিয়ার জন্য একেবারেই লাগসই। আজ উৎপাদনের প্রতিটি ক্রিয়াই প্রতিটি

স্তরে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত হতে শ্রমিকদের শ্রমকে সন্নিবেশিত করে। এই ই-কমার্স, ক্রেডিট কার্ডের মতো মূল্যের আঙ্গিকই পারে এই মাত্রায় পণ্য বিনিময়কে সচল রাখতে। টাকা বুর্জোয়া সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কারণ শ্রমক্ষমতা নিজেই এখানে একটি পণ্য। টাকার প্রবাহ ব্যবহারিক মূল্য গঠনের একটি বিশ্বস্ত আয়না। এই টাকা সম্পর্ক শ্রমকে কাজে লাগানোতে সহযোগিতা করার সঙ্গে সঙ্গে এর সারসত্ত্বাটিকে নাকচও করে দেয়। টাকা দিতে না পারলে বুর্জোয়া সমাজে কোনো কিছুই পাওয়া বা করা সম্ভব নয়। এই টাকার সম্পর্ক চক্রটি অতিক্রম করা ছাড়া পুঁজির উচ্ছেদ অকল্পনীয়। তবে একই সাথে এই উচ্ছেদের মানে সামাজিক শ্রমের নতুন কোনো উপায়ে সংগঠিত হওয়া।

ধর্ম (Religion)

"মানুষ ধর্ম তৈরি করে, ধর্ম মানুষকে তৈরি করে না। যে মানুষ হয় এখনো নিজেকে খুঁজে পায়নি কিংবা নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে, ধর্ম হলো তার আত্মচেতনা এবং আত্মসম্মান। কিন্তু মানুষ তো জগতের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে থাকা কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়। মানুষ হলো মানুষের জগৎ, রাষ্ট্র, সমাজ। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ পয়দা করে ধর্ম, এক ওলটানো জগৎ-চেতনা, কেননা সেগুলো হলো একটা ওলটানো জগৎ। ধর্মীয় ক্লেশ হলো একই বাস্তব ক্লেশের অভিব্যক্তি এবং বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবনের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হলো আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হলো জনগণের জন্য আফিম। মানুষের মায়াময় সুখ হিসেবে ধর্মকে লোপ করাটা হলো মানুষের প্রকৃত সুখের দাবি করা। বিদ্যমান হালচাল সম্বন্ধে মোহ পরিত্যাগ করার দাবিটা হলো যে হালচালে মোহ আবশ্যক সেটাকে পরিত্যাগ করার দাবি। তাই ধর্মের সমালোচনা হলো ধর্ম যার জ্যোতির্মণ্ডল সেই আত্ম উপত্যকার (এই পার্থিব জীবনের) সমালোচনার সূত্রপাত। (মার্কস, হেগেলের অধিকার দর্শনের পর্যালোচনার ভূমিকা)

"যেহেতু মানুষ এবং প্রকৃতির বাস্তব অস্তিত্ব, প্রকৃতির সত্ত্বা হিসেবে মানুষ মানুষের কাছে এবং মানুষের সত্ত্বা হিসেবে প্রকৃতি মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে হাতে-কলমের, সংবেদনগত, প্রত্যক্ষণযোগ্য, সেহেতু কোনো বিজাতীয় সত্তার ব্যাপারে প্রশ্ন, প্রকৃতি এবং মানবঊর্ধ্ব কোনো সত্তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা মানে প্রকৃতি এবং মানুষের অবাস্তবতাকে মেনে নেয়া বোঝায়। প্রশ্নটি প্রয়োগে অসম্ভব হয়ে গেছে। এই অবাস্তবতার অস্বীকৃতি হিসেবে নাস্তিকতা আর কোনো অর্থ বহন করে না, কারণ নাস্তিকতা হচ্ছে ঈশ্বরের নেতিকরণ, আর এই নেতিকরণের মাঝ দিয়েই মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য করে নেয়া। কিন্তু সমাজতন্ত্র হিসেবে সমাজতন্ত্রের আর এমন কোনো ঘুরপথের দরকার হয় না। সে সারসত্ত্বা হিসেবে মানুষ এবং প্রকৃতির তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক *সংবেদনগত* চৈতন্য হতে যাত্রা শুরু করে। সমাজতন্ত্র হলো মানুষের সদর্থক আত্মচৈতন্য, যার আর ধর্মকে উৎখাত করার মধ্যস্থতার দরকার পড়ে না। (মার্কস: *ইকোনমিক এন্ড ফিলোজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট*, ১৮৪৪)

নব্য হেগেলীয় (The Young Hegalians)

নব্য হেগেলীয়রা ছিল ১৮৪০ দশকের জর্মন এক বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাকারী দল। তাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল হেগেলের দার্শনিক উপসংহার মেনে নেয়ার চাইতে তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির চলমান প্রয়োগ। দলের মূল লোক ছিলেন ম্যাক্স স্টার্নার, লুডভিগ ফয়েরবাখ, ব্রুনো বাউয়ের, ডেভিড স্ট্রস এবং আর্নল্ড রুগে। কম বয়সী সদস্য ছিলেন অগাস্ত ফন, সিয়েস্কোভস্কি, কার্লস্মিড, এডগার বাউয়ের, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এবং কার্ল মার্কস। তাঁরা ধর্মের র‍্যাডিকাল পর্যালোচনাকে গুরুত্ব দিতেন, যার প্রধান ফসল হচ্ছে ডেভিড স্ট্রসের 'যীশুর জীবন' এবং ফয়েরবাখের 'খ্রিষ্টানত্বের সারসত্তা'।

নয়া হেগেলীয়দের বিশ্ববীক্ষার মূল বিশ্বাস ছিল যে, হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বোঝায় পৃথিবীর ইতিহাস দুটো স্তর পার হয়েছে। এক প্রাচীনকালের বস্তুবাদ আর দুই খ্রিষ্টানত্বে চিন্তাভাবনার আধুনিকতাবাদী কাল। এখন দার্শনিকদের কাজ হচ্ছে জটিল, প্রায়োগিক কাজগুলোকে সম্পন্ন করায়। এই মূল জায়গা থেকে তরুণ হেগেলীয়রা রাজনৈতিকভাবে অসহ্যরকম র‍্যাডিকাল হয়ে পড়েছিল। হেগেল বলতেন, 'যা কিছু যৌক্তিক তাই বাস্তব, আর যা কিছু বাস্তব তাই যৌক্তিক।' তারা বাস্তবকে যৌক্তিক করে পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নিলেন।

স্পিনোজা বলেছিলেন, সবকিছুর মাঝে ঈশ্বর, মানে প্রকৃতির মাঝে, আমাদের মাঝেও তাকে দেখা যায়। এভাবে গভীরতর দৃষ্টিতে আমি আর তুমি অভিন্ন। হেগেলের অন্যতম পূর্বজ শেলিং এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিলেন। অপর পূর্বজ ফিকটে কান্টের মন আর জগতের বিভাজনকে একত্রে আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে সবই হচ্ছে অহং। আমার বা তোমার অহং নয়, সর্বব্যাপী পরম অহং। যখন কেউ জগতের দিকে তাকায় যে তখন আসলে তার নিজের দিকেই তাকিয়ে থাকে।

এভাবে ফিকটে এবং শেলিং দু'জনেই মন এবং বস্তুর অদ্বৈততার মাঝে ঐক্যে পৌছানোর চেষ্টা করেছেন। হেগেল এই দুই প্রস্তাবনাকেই খুব একপাক্ষিক বলে ঘোষণা করলেন, চেষ্টা করলেন মনকে বস্তুতে (শেলিং) অথবা বস্তুকে মনে (ফিকটে) সংকুচিত করে আনতে। তাঁর মতে, মন ও বস্তু পরমের উভয়দিক। এই সংশ্লেষে হেগেল বিজ্ঞানের মতো ধর্মীয় চিন্তাকেও এক জায়গায় নিয়ে এলেন। দার্শনিক বিকাশ হচ্ছে মরমের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে বিকাশ।

হেগেল অন্তত এইটুকু ভেবেছিলেন। তার শিষ্যরা হয়ে গেল দু'ভাগ। একদিকে সনাতন হেগেলীয়রা বলতো, হেগেলের সাথে সাথে দার্শনিক বিকাশ পরিণতিতে পৌছে গেছে। নব্য হেগেলীয়রা বলতো যে, আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ যে হেগেলের উপরেই হেগেলকে প্রয়োগ করা, মানে হেগেলের পদ্ধতি প্রয়োগ করেই হেগেলকে ছাপিয়ে যাওয়া।

ডেভিড স্ট্রস হেগেলের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাইবেলের নতুন নিয়ম বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত টানলেন: ঈশ্বর যদি ধর্মতাত্ত্বিকদের বলা ঈশ্বরের মতো হন তাহলে খ্রিষ্টের মতো কারুর হয়ে উঠাটা অসম্ভব। যীশুখ্রিষ্ট আসল খ্রিষ্টের উপমার বেশি কিছু নন। আর এই আসল খ্রিষ্ট হচ্ছে স্বয়ং মানবজাতি। মানবজাতি নিজেই নিজের পাপের শাস্তি নিজে

গ্রহণ করে, পুরাতনের বোঝা টেনে নিজেরই রক্তের বিনিময়ে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করে।

লুডভিগ ফয়েরবাখ এরপর ঘোষণা করেন, মানবজাতি শুধু খ্রিষ্ট নয়, সেই স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর 'খ্রিষ্টানতত্ত্বের সারসত্ত্বা'য় তিনি দেখান, ঈশ্বরকে জানতে হয় অনুভব তথা স্বজ্ঞা দিয়ে। যদি এই অনুভবও ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে তাহলে অনুভবও কি ঐশ্বরিক নয়! এক ঝাঁক চতুর প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ফয়েরবাখ বুঝিয়ে দেন, ঈশ্বর বা স্বর্গীয় বলতে আমরা যা বোঝাই তা সেইসবের অনুভব মাত্র।

বিধেয় ছাড়া ঈশ্বর ফাঁকা উদ্দেশ্য মাত্র। এরকম কোনো কিছুই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের প্রশ্নই উঠে না। এমন ঈশ্বরের জন্য অনুভবের ঐশ্বরিকতাও তদ্রুপ। এই অনুভব আসলে আমাদের নিজেরই। মানুষের মধ্যেই আমাদের সারসত্ত্বার প্রকাশ। আমাদের ভেতরে ঈশ্বরের জন্য যে টান আমরা অনুভব করি, তা আসলে মানবজাতির জন্য, আমাদেরই সারসত্ত্বার জন্য।

হেগেল একপাক্ষিকতা থেকে মুক্ত নন। তিনি সংবেদন এবং বুদ্ধিকে বিবেচনায় নেননি, মরমের ঘর-সংসারের মনটিকে তিনি দেহসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষের সঙ্গে জুড়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

এখান থেকে শুরু করেন স্টার্নার। হেগেলের ফেনোমেনলজি যদি এক এবং একক 'আমি' দিয়ে পাঠ করা যায় তাহলেই স্টার্নারকে ভালোমতো বোঝা যাবে। হেগেলের কাছে পরম হলো নেতিবাচকের ক্ষমতা, মানে যা নির্ধারণের মধ্যে নেই, বরং যা প্রতিটি নির্ধারণী চিন্তাকে সমালোচনা করে। স্টার্নারের কাছে এই নেতিবাচকের ক্ষমতা হলো একক চৈতন্য, মানে আমি নিজে।

সিজোকোভস্কি হেগেলীয় আঙ্গিকের দর্শনের সঙ্গে আরো ভালোমতো খাপ খাওয়ানোর জন্য হেগেলীয় বিশ্বইতিহাস পরিমার্জন করে তৈরি করলেন। তিনি বললেন, আমরা অতীত (শিল্প) পার হয়ে এসেছি, যা ছিল বাস্তবের ধ্যানের স্তর। পৌছেছি বর্তমানে (দর্শন), যা আদর্শের ধ্যান। যেহেতু হেগেলের দর্শন ছিল দর্শনের যোগফল এবং নিখুঁত প্রকাশ সেহেতু দর্শনেরও কাল শেষ। এখন এসেছে নতুন যুগ, এই যুগ কর্মের। কিন্তু তাঁর এই কর্মের আহ্বান আমি করবো বলে না, বলে আমরা করা উচিৎ। এমনকি ফয়েরবাখের আমি, একটা প্রজাতি, একক মানুষ নয়। এভাবে শোনা গেল ব্যক্তির প্রজাতি স্বভাব বাস্তবায়নের ডাক। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আমাদের সারসত্ত্বা সামগ্রিকতায় বাস করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা অসহায় হয়ে পড়ে।

সামগ্রিকভাবে নব্য হেগেলীয়দের চিন্তার এসব কাঠামোর মাঝ হতেই কার্ল মার্কসের অভিযাত্রা শুরু।

নাগরিক (Citizen)

ইংরেজিতে নাগরিক শব্দটি মূলত অনেকগুলো মানেকে এক সাথে আধ-খ্যাচড়াভাবে প্রকাশ করে। এর আসল অর্থগুলো পাওয়া যাবে এর ফরাসি/জর্মন সমশব্দে।

ফরাসি citoyen মানে সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণকারী, রাজনৈতিক অধিকারের বাহক ব্যক্তি, ইতিবাচক স্বাধীনতা ভোগকারী, ফরাসি বিপ্লবের কালে, অথবা মার্কস যখন 'পুঁজি' গ্রন্থের ফরাসি সংস্করণের মুখবন্ধে 'নাগরিক' শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তা এই citoyen.

অপর দিকে এর জর্মন সমশব্দ Bürger পরিষ্কার ভাবে বোঝায় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তি অংশগ্রহণকারী হিসেবে কাউকে যে সামাজিক অধিকারেরর বাহক, যে অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না আর যতক্ষণ তা অন্যকে ক্ষতি না করে ততক্ষণ তা রক্ষা করা যায়। মানে নেতিবাচক স্বাধীনতা ভোগকারী। এই Bürger এর ফরাসি ভাষান্তর হল Bourgeois- বুর্জোয়া, এভাবে বুর্জোয়া হল ব্যক্তিদের শ্রেণী। Bürger কে কখনো ইংরেজিতে Indevidal করে ভাষান্তর করা হয়। Bürgerlicher Gessellschaft এর আক্ষরিক মানে, 'বুর্জোয়া সমাজ', যাকে সাধারণত ইংরাজিতে ভাষান্তর করা হয় 'Civil Society' হিসেবে।

দুই ভাষাতেই শব্দ দু'টির মানে অনেক বদলে গেছে। Büerger কে ইংরেজিতে বরং 'Burgher' করে অনুবাদ করা যায়, যার মানে বোঝায় সম্মানিত ব্যবসায়ী-যে কালে সম্পত্তি না থাকা মানে সমাজে, রাষ্ট্রে কোনো অধিকার না থাকা বোঝাত।

জর্মন ভাষায় Staatsbürger-কেও Citizen হিসেবে ভাষান্তর করা হয়, যার মানে Citoyen এর অনেক কাছাকাছি। বর্তমানে Staatsbürger বলতে পাসপোর্টধারী, বৈধ জর্মন জাতির কাউকে বোঝায় শুধু জর্মন অধিবাসী যা নন।

পূর্বানুমান (Presupposition)

যা কিছু আমরা আগে থেকে আছে বলে মেনে নিই, সাধারণত আর বিচার বিশ্লেষণ করি না তাকে পূর্বানুমান বলে।

প্রজা (Subject)

প্রজা বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি বা সত্ত্বা যে কোনো কাজ করে, সে কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকে, লক্ষণীয় সে কোনো বিষয় নয় যার ওপরে শুধু হুকুম বর্তাও হয়। ইতিহাসে প্রজা হলো কোনো ঘটনার সচেতন নির্মাতা, ঘটনার অচেতন হাতিয়ার নয়।

কান্ট 'প্রজা' ধারণাকে নৈতিকতা দিয়ে, নৈতিক আইনের প্রতি বাধ্য-বাধকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সমস্যা ছিল ব্যক্তি আর ব্যক্তি সমগ্রতে প্রজা ধারণা কিভাবে দেখা হবে তা নিয়ে। হেগেল বললেন, এই 'প্রজা' হলো কাজ-কারবারের এক আত্মচেতন পদ্ধতি যাতে *স্বতন্ত্র*, সার্বিক ও বিশেষ এর প্রেক্ষিতগুলো সমানে চালু থাকে। ঐতিহাসিকভাবে, স্বতন্ত্র প্রজা, সে যে সমাজ *বিষয়ীর* অংশ, তার কাছ হতে ক্রমাগত নিজেকে আলাদা করে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Immediate Knowledge)

প্রমাণ ছাড়া, সরাসরি সত্যের ধ্যানে পাওয়া জ্ঞান, যা কিনা অভিজ্ঞতার উপাত্ত কাজে লাগিয়ে, যৌক্তিকভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে পাওয়া অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপরীত।

প্রপঞ্চ (Phenomenon)

ইন্দ্রিয়ের মাঝে প্রকাশিত কিছু, যা অভিজ্ঞতার সীমানা মানে না। প্রপঞ্চ *প্রতিভাসের* সমার্থক।

বাজার (Market)

মূলত বাজার হলো ক্রেতা এবং বিক্রেতার একত্রিত হওয়া এবং দরাদরি করে দামের ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছবার জায়গা। আধুনিককালে এই জায়গাটি হয়ে গেছে একটি সামাজিক ক্ষেত্র। বাজার হলো একটি বিস্তৃত সামাজিক গঠন যাতে মানুষের প্রয়োজন মেটে, অপর মানুষের শ্রম দিয়ে বিনিময় সম্পর্কের এক জটিল জালের মাধ্যমে যেখানে বাজারের প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। বাজার একই সঙ্গে কার্যকরী চাহিদা অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য মূল্য প্রদান করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম লোকদের উপস্থিতিও বোঝায়।

উৎপন্ন বিনিময়ের কার্যকরী উপায় হওয়ার পাশাপাশি বাজার প্রতিটি ব্যক্তির বাজারে আনা উৎপন্নের দাম নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেও কাজ করে। বাজার কেমন করে দাম নির্ধারণ করে, এডাম স্মিথ তা ব্যাখ্যা করেন:

বাজার দর বড় মাপের উঠানামা দেখবে, কখনো তা হঠাৎ করেই বেশ নিচে নেমে যাবে, আবার কখনো স্বাভাবিক দরের চাইতে অনেক বেশি উপরে উঠে যাবে। অন্য প্রজাতির শিল্পে সমান পরিমাণ শ্রমের উৎপন্ন সবসময়ই প্রায় এক বা একই রকম। এখানে তা কার্যকরী চাহিদার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে ভালো। যখন সেই চাহিদা একই রকম থাকতে থাকে, ফলে পণ্যসমূহের বাজার দর একই রকম থাকে তখন সব মিলিয়ে স্বাভাবিক দরের অনুরূপভাবেই তাকে বিচার করা যায়।" (এডাম স্মিথ, *Wealth of the Nation 1776*, Book, ch. 7)

জন স্টুয়ার্ট মিলের কাল হতে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এডাম স্মিথের চেয়ে বাজারকে বেশি ক্ষমতা দিয়ে দেন। এডাম স্মিথ মূল্য বা স্বাভাবিক দরের মতো কিছু জিনিস মানতেন যার সাপেক্ষে দামের ওঠানামা হয়। পরের অর্থনীতিবিদরা বাজারকেই মূল্য নির্ধারণের একমাত্র ঠিকাদারী দিয়ে ফেলেন।

আরো সাম্প্রতিক কালে ক্যানেথ অ্যারোর মতো অর্থনীতিবিদরা বাজারকে মনে করেন অর্থনৈতিক দালালদের এক নেটওয়ার্ক, যারা অপর দালালদের কাছে সংবাদ পাঠায় এবং বিনিময়ে পাওয়া সংবাদগুলোকে হিসেব করে সিদ্ধান্ত নেয় যার ফল হলো শৃঙ্খলাহীন, গতিশীল এক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সাম্যাবস্থা বাজারের ধারণার চাইতে অনেকটাই ভিন্ন।

শ্রমের বিনিময় হচ্ছে শ্রম সহযোগিতার সবচেয়ে মৌলিক *আঙ্গিক*, তাই বাজারের গঠন হচ্ছে সমাজ গঠনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। এভাবে বাজারের জায়গাগুলোই হয়ে উঠতো শহর এবং এখন খোদ *জাতি* গড়ে উঠছে সাধারণ বাজারকে ভিত্তি করে।

"নিজেদের প্রস্তুতকৃত মালের অবিরত বেড়ে চলা বাজারের জন্যে তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।"

<u>বুর্জোয়া</u> শ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদনের আর পরিভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। যে জাতীয় ভূমিটার ওপর শিল্প দাঁড়িয়েছিল সেটাকে শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়ে তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করেছে। সমস্ত সাবেকী জাতীয় শিল্পকে হয় ধ্বংস করা হয়েছে, নয় প্রত্যহ ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন এমন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা-বাঁচা প্রশ্নের শামিল, যেসব শিল্পে কাজ চলে দেশজ কাঁচামাল নিয়ে আর নয়—দ্রুততম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে; যেসব শিল্পের উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। দেশজ উৎপন্ন যা মিটত তেমন সব পুরাতন চাহিদার বদলে দেখছি নতুন নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার দূর-দূর দেশের এবং আবহাওয়ার উৎপন্ন। আগেকার স্থানীয় আর জাতীয় বিচ্ছিন্নতা আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার জায়গায় দেখা যাচ্ছে সর্বতোমুখী আদান-প্রদান, জাতিসমূহের পৃথিবীজোড়া পরস্পরনির্ভর, বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই মানস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। এক-একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একপেশেমি আর সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই আরো অসম্ভব হয়ে পড়ে; বহু জাতীয় আর স্থানীয় সাহিত্য থেকে দেখা দেয় বিশ্বসাহিত্য। (মার্কস-এঙ্গেলস: *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রথম অধ্যায়)

তবে বাজার নিয়ে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো নিও-লিবারেলদের বাজারকে একেবারে ঐশ্বরিক সত্ত্বা বানিয়ে ফেলবার ঝোঁক। তারা এর মাঝেই মানবজাতির সমস্ত রোগের ওষুধ দেখেন। *Wealth of Nation*-এ এডাম স্মিথের কৌতূহল উদ্দীপক উদ্ধৃতি দেখুন:

সে শুধু নিজের লাভই চায়, আর তা করতে গিয়ে অন্য অনেক কিছুর মতোই সে এক অদৃশ্য হাতের দ্বারা চালিত হয় এমন এক লক্ষ্যের দিকে যা তার অভিপ্রায়ের অংশ ছিল না। তবে তা এই অভিপ্রায়ের অংশ না হওয়ায় সব সময় তা সমাজের জন্য নিকৃষ্টতম নয়। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে সে প্রায়ই সমাজের উদ্দেশ্যেও পূরণ করে, আর তা সে নিজে ইচ্ছে করলে যেমন হবে তার চেয়েও কার্যকর। জনগণের ভালো করতে যারা বাণিজ্য করেন তারা আসলেও কিছু করতে পেরেছেন, আমি অন্তত এমন দেখেনি। এমন মায়া-দয়া অবশ্য বণিকদের মাঝে দুর্লভ, তাদেরকে নিবৃত্ত করবার জন্যও বেশি কথা খরচ হয় না। (Adam Smith: *Wealth of Nations*, ch. 2, Book 4)

একেবারে আকাট অর্থনীতিবিদরাই এখনো বাজারের মাধ্যমে সব সামাজিক সমস্যা সমাধানের গা জোয়ারি করেন:

"পুঁজি কেবল সুবিধাজনক প্রচেষ্টাই গ্রহণ করে, ... পুঁজির সর্বোচ্চ বিকাশ তখনই হয় যখন সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সাধারণ শর্তগুলো সামাজিক আয়ের হিসাব রাষ্ট্র কর হতে না করে বরং পুঁজি হিসেবে পুঁজি হতে পরিশোধিত হয়। পুঁজি যে সামাজিক উৎপাদনের শর্তগুলো কি মাত্রায় নিজের বশীভূত করেছে এ হতেই তা বোঝা যায়। অপরদিকে এ হতে বোঝা যায় সামাজিক সম্পদের পুনরুৎপাদন কি মাত্রায় পুঁজিকৃত হয়েছে। আর সমস্ত প্রয়োজনই তো পূরণ হয় বিনিময় আঙ্গিকের দ্বারা। (Marx: *Grundrisse*, Part 10)

মহামন্দার পরে, বাজার যে সবার প্রয়োজন মেটাবার মতো সাম্যাবস্থা কোনো না কোনো ভাবে খুঁজে নেয়, এই ধারণা চিরকালের মতো শেষ হয়ে যায়। জন মেনার্ড কেইন্স ১৯৩৫ সালে তার *General theory of employment-Interest & money* গ্রন্থে দেখান যে, এমনকি মন্দার কালেও বেকারত্ব দূর করার মতো মাত্রায় মজুরি পৌঁছাতে পারে না। মন্দার সময় হয় ব্যক্তি বিনিয়োগ ব্যাপক হারে বাড়াতে হয়, নয়তো তার ঘাটতি পূরণের জন্যে সরকারি বিকল্প সৃষ্টি করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা সরকারগুলো কেইন্সীয় অর্থনীতির প্রতি বিশ্বস্ত তা রেখেই বাজার ওঠাপড়ার ক্ষতিকর প্রভাবের সীমা বেঁধে দিতে থাকেন।

তবে এখন পর্যন্ত শেষ কথা হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপরীতে বাজারকে বিলোপের ভাবনা বহুরকমের সাবধানতা দাবি করে।

বাস্তব (Real/Actual)

প্রক্রিয়া এবং ধারণা বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত দার্শনিক ধারণা। দর্শনে বাস্তব বলতে চিন্তার বিপরীতে বস্তুময়তার দিকে নির্দেশ করা হয় না। মানসিক কারবারগুলো বস্তুগত জিনিসের মতোই বাস্তব, তা বরং সম্ভাবনাসমূহ হতে নির্দিষ্ট একটি বাস্তবতার দিকে চলমান। সমাজ বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে বাস্তবতা বোঝায় কোনো কিছুর আবশ্যক/অনাবশ্যক সমস্ত অবস্থার একত্রে আসাকে, সম্ভাবনা অতিক্রম করে বাস্তব হয়ে ওঠাকে।

কোনো কিছু চিনে নেয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবতা বোঝায় কোনো কিছুকে এমন বিন্দুতে অনুধাবন করা যেখানে সব *কারণ ও কার্যগুলো* পারস্পরিকভাবে আন্তঃসম্পর্কিত, আর ঐ জিনিসটির *প্রত্যক্ষ* রূপকে বুঝতে হয় তার অস্তিত্ব ও আবশ্যিক আধেয়'র সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হিসেবে।

বিকাশ (Development)

বিকাশ বলতে বোঝায় এমন এক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যাতে কোনো কিছু ক্রমাগত আরো শক্ত-পোক্ত, পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। এর বিপরীতে আছে একটি জিনিসের অস্তিত্বমানতার জন্য অন্য একটি জিনিসের জায়গা ছেড়ে দেয়া অথবা *আঙ্গিক এবং আধেয়'র* সংগ্রামের পথে বা *কার্যকারণে'র* অদল বদলে কোনো জিনিসের অন্য জিনিসে উত্তরণ ঘটা।

বিচ্ছিন্নতা (Alienation)

যে প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেরই বাস করা জগতে অচেনা হয়ে পড়ে তাকে বিচ্ছিন্নতা বলে। প্রতিটি সমাজে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় তত্ত্বে বলা হয়ে থাকে কোনো এক সোনালী অতীতের কথা যখন মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতো। তারপর এতে অবনতি ঘটে। আবার কোনো এক সময় মানুষ সেই রকম সুখের দিন ফিরে পাবে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে। এভাবে প্রতিটি ঐতিহাসিক কালপর্বেরই একেকটি বিচ্ছিন্নতার ধারণা তৈরি হয়।

মার্কস তার 'ইহুদি প্রশ্ন প্রসঙ্গে' প্রথম বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি ব্যবহার করেন। তিনি

হেগেলের পর্যালোচনার মাধ্যমে আধুনিক *বুর্জোয়া* সমাজে সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতা প্রদর্শন করেন। হেগেলের মতে, মানুষের নিজের কাজকর্মই একটা সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যা পরে তাদের সামনে এক অচেনা বিজাতীয় শক্তি হিসেবে রুখে দাঁড়ায়। তবে মানুষের কাজকর্মকে হেগেল মরমের প্রকাশ হিসেবে দেখতেন।

মার্কস প্রথমে দেখালেন, মানুষের শ্রমই সংস্কৃতি এবং ইতিহাস তৈরি করে অর্থাৎ মরম বা ভাব মানুষেরই উৎপন্ন। দ্বিতীয়ত হাতে-কলমের কাজ বস্তুগত দুনিয়াকে বদলে ফেলে, তাই হাতে-কলমের কাজ হলো বিষয়, আর তাই শ্রম-প্রক্রিয়া হলো মানুষের ক্ষমতার বিষয়করণ। কিন্তু যদি নিজেদের উৎপন্নের সঙ্গে শ্রমিকরা নিজেদের *সারসত্তার* প্রকাশ হিসেবে সম্পর্কিত হয়, তাদের উৎপাদনের মধ্যেই নিজেদেরকে চিনে নিতে পারে, তেমনভাবেই অন্যদের দ্বারাও যদি সেই চিনে নেওয়াটি স্বীকৃত হয়, তাহলে তা বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি না হয়ে খাঁটি মানবিক সম্পর্ক হবে।

"আমার কাজ হবে আমার জীবনের মুক্ত প্রকাশ, মানে জীবনের উপভোগ। ব্যক্তিসম্পত্তি পূর্বানুমান করে নিলে আমার জীবন হবে জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, কারণ আমি কাজ করি বেঁচে থাকার দায়ে, জীবিকা উপার্জনের জন্য। তখন আমার কাজ আমার জীবন নয়।" (K. Marx: Comments on J. Mill)

মার্কস দেখান যে, বুর্জোয়া সমাজে শ্রমের বিশেষ চরিত্র অর্থাৎ মজুরি-শ্রম বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে নিবিড়তম আঙ্গিক। মজুরি শ্রমিকরা জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের শ্রম-ক্ষমতা বিক্রি করে, পুঁজিপতিরা শ্রম-প্রক্রিয়ার মালিক হয়। এখানে শ্রমিকের শ্রমের উৎপন্নটি বাস্তব অর্থেই শ্রমিকের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন, তা আর শ্রমিকের উৎপাদন নয়, বরং পুঁজিপতির উৎপাদন। যে লাঠিটা শ্রমিকের পিঠে পড়বে, শ্রমিকেরা নিজের হাতেই তা বানায়। আর একবার সেই পণ্য যদি *বাজারে* ঢুকে যায় তখন তার ওপর কারোরই আর নিয়ন্ত্রণ নেই, সেই পণ্য তখন যেন গায়েবি নিয়মেই চলাচল করে। (বাজার, টীকা দেখুন)

বিচ্ছিন্নতা আর তখন মানুষের উৎপাদন বলে মনে হয় না, কারণ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় দুটো জিনিসের মধ্যে, মানুষ সেখানে গৌণ। বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করা যাবে শ্রম-প্রক্রিয়াতে বাস্তব মানবিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে, মানুষ যদি নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে, শুধু জীবিকা অর্জন নয় বরং নিজের মানব স্বভাব প্রকাশ করার জন্য কাজ করে তাহলে।

বিজ্ঞান (Science)

বিজ্ঞান হলো সামাজিকভাবে অর্জিত জ্ঞানের সঞ্চয় এবং পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীকরণ, পরীক্ষণ, যাচাই, পর্যালোচনার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং চর্চা আর সেইসব চর্চার বিন্যাস এবং সামগ্রিক একটি পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত তত্ত্ব। বিজ্ঞান হলো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সংগঠিত করবার বিভিন্ন উপায়ের একটি। যার অংশ হচ্ছে সমন্বিত সমগ্রের দিকে বিকাশমান তাত্ত্বিক জ্ঞান যা প্রমাণের আঙ্গিকে নিজেকে ধরে রাখে।

বিষয় ও বিষয়ী (Object and Subject)

জ্ঞানের প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়ী বলতে বোঝায় *চৈতন্য* এবং ইচ্ছাসহ সক্রিয়, নিজেকে চিনতে থাকা স্বতন্ত্র বা সমাজদল। বিষয় মানে যার উপরে বিষয়ীর কাজকর্ম প্রযুক্ত হয়। বিষয় এবং বিষয়ী একটি ঐক্য। জগতের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ বিষয়ী তার একটি অংশ।

"পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদের এবং ফয়েরবাখের বস্তুবাদও তার অন্তর্ভুক্ত—প্রধান দোষ এই যে, তাতে বস্তু, বাস্তবতা বা সংবেদ্যতাকে কেবল বিষয় রূপে বা ধ্যান রূপে ধরা হয়েছে, মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া হিসেবে, ব্যবহারিক কর্ম হিসেবে দেখা হয়নি, বিষয়ীগতভাবে দেখা হয়নি। ফলে বস্তুবাদের বিপরীতে সক্রিয় দিকটি বিকশিত হয়েছে ভাববাদে, কিন্তু তা কেবল অমূর্তভাবে। কেননা অবশ্যই ভাববাদ সংবেদনগত ক্রিয়া ঠিক যা সেইভাবে তাকে জানে না। ফয়েরবাখ চান সংবেদনগত বিষয়কে চিন্তাগত বিষয় থেকে সত্যই পৃথক করতে, কিন্তু খোদ মানবিক ক্রিয়াটাকে তিনি বস্তুগত ক্রিয়া হিসেবে ধরেন না। অতএব, Essence of Christianity (খ্রিষ্টধর্মের মর্মবস্তু) গ্রন্থে তিনি একমাত্র তাত্ত্বিক ক্রিয়াকেই খাঁটি মানবিক ক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন: অপরপক্ষে ব্যবহারিক কর্মকে নোংরা দোকানদারি চেহারায় ধরা হয় এবং শুধু সেভাবেই তাকে স্থিরবদ্ধ করা হয়। তাই বৈপ্লবিক, ব্যবহারিক বৈচারিক ক্রিয়ার তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন না।" (কার্ল মার্ক্স, ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ, ১নং থিসিস)

বুর্জোয়া (bourgeois)

মানব সমাজকে বিশ্লেষণ করবার জন্য ব্যবহৃত একটি শ্রেণীকরণ। মূল শব্দটি ফরাসি, বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের সামন্ত প্রথায় 'বুর্জোয়া'রা ছিল থার্ড এস্টেটের ধনী শ্রেণী গোষ্ঠী। তারা অভিজাততন্ত্রের কোন সুবিধা পেত না, বাড়তি করের বোঝায় অতিষ্ট ছিল। বসতভিটার আকার বা রোজগার–এসব দিয়ে কারা বুর্জোয়া তা নির্ধারিত হত। শব্দটি গড়ে উঠেছিলো বণিকদের বোঝাতে, উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত শব্দটি মধ্যবিত্তের (অভিজাত আর ভূমিদাস বা সর্বহারা'র মাঝে বিশাল আর্থ-সামাজিক পটভূমিভুক্ত জনগোষ্ঠী) সমার্থক ছিলো। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে অভিজাতদের ক্ষমতা ও সম্পদ মিলিয়ে গেলে বুর্জোয়ারা নতুন শাসক শ্রেণী হয়ে আবির্ভূত হয়।

ফরাসি বুর্জোয়া bourgeois শব্দটি এসেছে পুরাতন ফরাসি burgeis থেকে যার মানে 'শহরবাসী' (তুলনীয় মিডল ইংলিশ burgeis, মিডল ডাচ burgher এবং জর্মন Bürger)। পুরাতন ফরাসী শব্দটি এসছে ক্ষয়িষ্ণু লাতিন burgus থেকে, যার মানে 'দুর্গ'।

য়ুরোপের মধ্যযুগে শহর গড়ে ওঠার সাথে কারুকর্মী আর বেনিয়ারা দৃশ্যমান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। ব্যবসা আর নিজেদের সামাজিক স্বার্থ রক্ষায় তারা সঙ্ঘ, গিল্ড, কোম্পানি গড়ে তোলে। এরাই ছিল প্রথম বুর্জোয়া।

মধ্যযুগ শেষ হয়ে রেনেসাঁস শুরু হতে তারা ক্রমে অভিজাত শ্রেণীকে হটিয়ে

ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড জাতি রাষ্ট্রগুলোতে শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। ১৭ ও ১৮ শতাব্দীতে চরম সামন্ত প্রথা বিলোপে তারা সাধারণভাবে ফরাসি ও আমেরিকান বিপ্লবকে সমর্থন করে দ্রুত বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়, শেষে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সময়েই মলিয়ের, ফ্লবার্টের মত সাহিত্যিকেরা বুর্জোয়াদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা, লোভ, ভণ্ডামি, অপরিশিলিত সংস্কৃতির জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে গেছেন। সে সময় সফল বুর্জোয়া মানে ছিল লগ্নির উপার্জনে অলস জীবন কাটানো।

বাণিজ্য এবং বাজার অর্থনীতি প্রসারের সাথে বুর্জোয়ারা আকারে, প্রভাবে এবং ক্ষমতায় বেড়ে ওঠে। প্রতিটি শিল্পায়িত দেশে অভিজাত তন্ত্র হয় মিলিয়ে যায় নয়তো বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত হয়। এভাবে বুর্জোয়ারা সামাজিক আধিপত্যের শিখরে পৌছয়।

মার্ক্সপন্থীরা বুর্জোয়াদের সংজ্ঞায়িত করেন এমন সামাজিক শ্রেণী হিসেবে যাদের রোজগারের উৎস হচ্ছে পুঁজি সম্পদে মালিকানা বা ব্যবসা, অথবা ব্যবসায়িক কাজ-কারবার যেমন পণ্য এবং সেবা ক্রয় এবং বিক্রয়। মধ্যযুগে এরা ছিল স্ব-নিয়োজিত ক্ষুদ্র নিয়োগদাতা, উদ্যোক্তা, ব্যাঙ্কার, বণিক। শিল্প পুঁজিতন্ত্রের আমলে বুর্জোয়া হয়ে যায় শাসক শ্রেণী, মানে উৎপাদন উপকরণের (জমি, কারখানা, দফতর, পুঁজি, সম্পদ) মালিক। সেই সাথে জবরদস্তির মাধ্যমগুলোও (ফৌজদারি ব্যবস্থা, জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী, জেল-জরিমানা) তার এখতিয়ারে থাকে। এর বিপরীতে থাকে বিশাল জনগোষ্ঠী যাদের সামনে সম্পত্তি, উৎপাদনি উপকরণের মালিকদের কাছে বেঁচে থাকার জন্য শ্রম বিক্রি করা ভিন্ন উপায় থাকে না।

মার্ক্স বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্ব, সিভিল সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে এর দৃষ্টিভঙ্গিতে বুর্জোয়াদের নিজস্ব ধারণা আর এই সব ধারণা তৈরি এবং জিইয়ে রাখার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সার্বিকভাবে সত্য বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে পর্যালোচনা করে দেখান যে এসব আসলে নতুন শাসক শ্রেণী হিসেবে তাদের ভাবাদর্শ মাত্র, যার ফিকির হল নিজের মত করে সমাজকে ছাঁচে ফেলা।

সাধারণভাবে মার্ক্স 'বুর্জোয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন একটি সামাজিক শ্রেণীর বিষয়গত বর্ণনা এবং ব্যক্তি পুঁজি মালিকানা নির্ভর জীবনধারা বোঝাতে। তিনি তাদের পরিশ্রমী চরিত্রের স্বভাবের তারিফ করে তাদের নৈতিক ভণ্ডামির সমালোচনা করেছেন (যেমন কমিউনিস্ট ইশতেহারে)। এই শ্রেণীর ভাবাদর্শ বর্ণনা করতেও শব্দটি ব্যবহার করেছেন; যেমন, তাদের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণাকে বলেছেন "বুর্জোয়া স্বাধীনতা"। তিনি বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া পরিবার প্রথা, বুর্জোয়া সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়েও লিখেছেন, সব ক্ষেত্রেই এই সব আদর্শকে তিনি শ্রেণী-সমাজের বহাল থাকার সাপেক্ষে অস্তিত্বশীল বলে উপস্থাপন করেছেন।

বুর্জোয়া সমাজ বা পুঁজিতন্ত্র- হল এমন সমাজ সংগঠন যাতে পণ্য সম্পর্ক, মানে কেনা আর বেচা'র সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এখানেও পরিবার ও রাষ্ট্র থাকে। তবে পরিবার ক্রমাগত ক্ষুদ্র নিঃসঙ্গ পর্যায়ে নিছক বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার জায়গায় গিয়ে

ঠেকে। রাষ্ট্র এখানে জবরদস্তির হাতিয়ারগুলো ধরে রাখে, তবে ক্রমেই সে বাণিজ্যিক স্বার্থের খপ্পরে পড়ে, তার কার্যক্রম সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে সেবা কেনা-বেচার দালালিতে গিয়ে ঠেকে।

বুর্জোয়া সমাজে শাসক শ্রেণী বুর্জোয়ারা ব্যক্তিসম্পত্তি হিসেবে উৎপাদন মাধ্যমগুলোর মালিক। অথচ এখানে উৎপাদন শক্তিগুলো পুরোপুরি সমাজিকৃত, তার কাজ-কারবার চলে বিশ্ববাজারে।

এখানে উৎপাদন করে সর্বহারা, যে শ্রেণীর কাজ করবার সামর্থ্য ছাড়া বিক্রি'র আর কিছু নেই, সমস্ত উৎপাদন মাধ্যমের মালিকানা বুর্জোয়াদের হাতে থাকার ফলে শ্রমিকদের শ্রম-শক্তি বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রি ছাড়া উপায় থাকে না। শ্রম শক্তির এই কেনা-বেচার পদ্ধতিকে বলে মজুরি-শ্রম।

বুর্জোয়া সমাজে টাকা ও বিভিন্ন রকমের ক্রেডিট পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়। ফলে মনে হয় টাকা যেন জলের মতই নিজের ধর্মে চলে, আবহাওয়ার মতই মানুষ তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, নিজে তার হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়।

আদিম গোত্রগুলো যেমন বিশ্বাস করতো যে তাদের জীবন নির্ধারিত হয় মানব ক্ষমতা সম্পন্ন বৃক্ষ, প্রাণী আর প্রাকৃতিক শক্তির হাতে, বুর্জোয়া সমাজে তেমনি চালু থাকে 'পণ্য পূজা'। মানুষের জীবন এখানে পরিচালিত হয় টাকা ও অন্যান্য পণ্যের জোরে, এদের মূল্য নির্ধারিত হয় যেন অতিজাগতিক নিয়মে। আগের কালে নীতি যেমন নিয়ন্ত্রিত হত বিশ্বাস আর কাল্পনিক শক্তির প্রথাগত পদ্ধতিতে, এই সমাজে তার জায়গা নেয় নগদ লেন-দেনের নীতি।

ব্যক্তিসম্পত্তি (Private Property)

ব্যক্তিসম্পত্তি হলো কোনো ব্যক্তির কোনো বিষয়কে অপরের ব্যবহার করবার ব্যাপারটি বাদ দেয়ার অধিকার, তার সূত্র ধরে সমাজকে শ্রেণীতে বিভক্ত করা। ব্যক্তিসম্পত্তি অনিবার্যভাবে অপরের ব্যক্তিসম্পত্তির অস্বীকার, যার চূড়ান্ত প্রকাশ হচ্ছে মজুরি শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক।

"শ্রম এবং পুঁজির এন্টিথিসিস হিসেবে অনুধাবন করতে না পারলে সম্পত্তিহীনতা এবং সম্পত্তির মাঝের এন্টিথিসিসটি একটি অবিচ্ছেদ্য এন্টিথিসিস হিসেবে থেকে যায়। তখন এদের সক্রিয় সংযোগে, তাদের অন্তর্গত সম্পর্কে বোঝা যায় না। আর তা না হলে একে দ্বন্দ্ব হিসেবেও অনুধাবন করা যায় না। এটা প্রকাশিত হতে পারে এই প্রথম আঙ্গিকেও; এমন কি ব্যক্তিসম্পত্তির অগ্রসর বিকাশ ছাড়াই—যেমন প্রাচীন রোম, তুরস্ক ইত্যাদিতে। এটি তখনো খোদ ব্যক্তিসম্পত্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিসেবে প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু শ্রম (সম্পত্তির বর্জন হিসেবে ব্যক্তিসম্পত্তির বিষয়ীগত সারসত্ত্বা) এবং পুঁজি (শ্রমের বর্জন হিসেবে বিষয়গত শ্রম) ব্যক্তিসম্পত্তি গঠন করে এর দ্বন্দ্বের বিকশিত দশা হিসেবে আর তাই তা হয় সমাধানের দিকে ধাবমান এক গতিশীল সম্পর্ক। [মার্কস: *ব্যক্তিসম্পত্তি এবং কমিউনিজম*]

ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদ একই সাথে মানবতার মুক্তি, কারণ তখন ব্যক্তির সাথে

ব্যক্তির সম্পর্ক হবে সরাসরি, কোনো জিনিসের মধ্যস্থতা ছাড়া।

"তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অতিক্রম হলো সমস্ত মানবিক সংবেদন এবং গুণাবলীর পরিপূর্ণ মুক্তি। তবে এটা যে এমন এক মুক্তি সংক্ষেপে তার কারণ হলো—তখন এসব সংবেদন এবং গুণাবলী বিষয়ীগত এবং বিষয়গতভাবে মানবিক হয়ে যায়। চোখ হয়ে যায় মানবিক চোখ, ঠিক যেমন এর বিষয় হয়ে যায় সামাজিক, মানবিক বিষয় মানুষ দ্বারা মানুষের জন্য তৈরি করা বিষয়। তাই সংবেদনগুলো সরাসরি তাদের প্রয়োগে তাত্ত্বিক হয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জিনিসটার খাতিরে, কিন্তু জিনিসটা নিজে নিজের সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে একটা বিষয়গত মানবিক সম্পর্ক এবং এর উল্টোটাও। প্রয়োজন অথবা উপভোগ ফলতই তাদের অহমগত স্বভাব হারায় আর প্রকৃতি হারায় এর নিছক উপযোগ, তা হয় ব্যবহার মানবিক ব্যবহার হওয়ার ফলে।

একই পথে, অন্য মানুষের সংবেদন এবং উপভোগ আমার নিজের যথার্থকরণ হয়ে যায়। তাই এইসব সরাসরি অঙ্গের পাশাপাশি সামাজিক অঙ্গও সমাজের আঙ্গিকে বিকশিত হয়। যেমন অন্যদের সঙ্গে সরাসরি সম্মিলনে ক্রিয়াকাণ্ড আমার নিজের জীবন প্রকাশের একটা অঙ্গ, আর মানবজীবনকে যথার্থকরণের একটা ধরন হয়ে যায়। [মার্কস: *ব্যক্তিসম্পত্তি ও কমিউনিজম*]

ব্রুনো বাউয়ের (Bruno Baeur, 1809-1882)

১৩ এপ্রিল বার্লিনে এক ব্যক্তি মারা গেছেন, যিনি এক সময়ে দার্শনিক হিসেবে এবং ব্রহ্মবিদ্যাবিদ হিসেবে একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রেনাঁ সমেত সরকারি ব্রহ্মবিদ্যাবিদেরা তিনি আর নেই বলে ধরে নিয়েছিলেন...। অথচ যোগ্যতায় তিনি ছিলেন তাঁরা সবাই মিলে যা তার চেয়ে বেশি।... (এঙ্গেলস, ব্রুনো বাউয়ের এবং গোড়ার খ্রিষ্টধর্ম)

জর্মন দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক। বাবা ছিলেন পোর্সেলিন কারখানার রঙমিস্ত্রি। ১৮৩১ সালে হেগেলের মৃত্যু পর্যন্ত সরাসরি তাঁর ছাত্র ছিলেন। হেগেল একবার ইমানুয়েল কান্টকে পর্যালোচনা করে এক রচনার জন্য তরুণ বাউয়েরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেন। তিনি বার্লিনের ফ্রেডরিখ ভিলহেল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে রক্ষণশীল হেগেলীয় ঘরানায় যোগ দেন। তাঁর জীবনের মধ্যখানে আছে ১৮৪৮-এর বিপ্লব। ১৮৪০-এর দিকেই তিনি আবার হেগেলের প্রজাতন্ত্রী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে *বামপন্থী হেগেলীয়দের* নেতা হয়ে উঠেন। হেগেলের বিষয়ীগত মরমের ধারণা থেকে তিনি তাঁর অসীম আত্মচৈতন্যের তত্ত্বের ধারণা দাঁড় করান। এই তত্ত্বে ঐতিহাসিক প্রগতি এবং যৌক্তিক আত্মসার্বভৌমত্বই হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্য। খ্রিষ্টানধর্মের পুথিপত্রের তত্ত্ব-তালাশ করে তিনি ধর্মকে বিচ্ছিন্নতার একটি রূপ হিসেবে প্রদর্শন করেন। তাঁর মতে, দুনিয়াবী জীবনের দুঃখ-দুর্দশার অভাব সত্তার ওপরে অযৌক্তিক অতীন্দ্রিয় সব ক্ষমতা আরোপ করে, তারই সাথে ছোট ছোট টুকরোতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া মানুষের দল এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক স্বার্থে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। জর্মন অঞ্চলের *রাষ্ট্র* এর সামাজিক

এবং আইনগত ভিত্তি এবং গোঁড়া ধর্মীয় ভাবাদর্শ বাউয়েরের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার শিকার হয়। তিনি উদারতাবাদ পরিত্যাগ করেন, কারণ তা বহাল ব্যবস্থার সঙ্গে আপোস করে আর মুক্তি এবং সম্পত্তির মাঝখানের হিসেবটা মেলাতে গড়মিল করে ফেলে। তিনি সমাজতন্ত্রকেও খারিজ করেন, কারণ তাঁর মতে, এতে ব্যক্তির আত্মসার্বভৌমত্ব যথেষ্ট মর্যাদা পায় না। ১৮৪৮-এর বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পর বাউয়ের হেগেলকে নিয়ে নতুন করে ভাবেন। ক্রান্ত দর্শন এবং উদারনৈতিক ও বিপ্লবী _রাজনীতির_ ব্যর্থতার ফলে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার এক মহাসংকটের ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করেন, তবে এও বলেন, এই মহাসংকট থেকেই মুক্তির পথ বের হয়ে আসবে। তাঁর শেষ দিককার রচনায় বিশ্বশক্তি হিসেবে রাশিয়ার অভ্যুদয় বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। এসব রচনাবলী থেকে নিটশে সাংস্কৃতিক নবায়নের কথা ভাবতে উদ্বুদ্ধ হন।

১৮৪২ সালে তাঁর মতামতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পদটি কেড়ে নেয়া হয়। ১৮৪২ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক সাংবাদিকতা এবং ঐতিহাসিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি ১৮৪২-৪৩ সালের দিকে প্রুশিয়ার ইহুদিদের রাজনৈতিক মুক্তির বিপক্ষে মত রাখেন। যুক্তি ছিল তাহলে নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্বার্থকে রাজনৈতিক বৈধতা দেয়া হবে। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের 'পবিত্র পরিবার' (১৮৪৪) এবং জর্মন ভাবাদর্শ (১৮৪৫-৪৬) গ্রন্থে ব্রুনো বাউয়েরের মতামতকে আক্রমণ করেন। ভাই এডগার বাউয়েরকে নিয়ে ১৮৪৮ সালে তিনি শার্লটেনবুর্গ গণতান্ত্রিক সমিতি গঠন করে প্রুশিয়ার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্যর্থ হন। এরপর থেকে বাইবেল সমালোচনা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ওপর তার প্রচুর লেখালেখি পাওয়া যায়। ১৮৫০-এর মাঝামাঝি সরকারপন্থী 'দাই জেইত' পত্রিকায় তার লেখালেখি উদারনৈতিকতার বিরোধিতা হতে রক্ষণশীল দিকে বাঁক নেয়।

১৮৩০ জুড়ে বাউয়ের চিন্তা এবং সত্ত্বাকে যৌক্তিক বিশ্বাসের সুতো দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করেন। তিনি খ্রিষ্টীয় তত্ত্বগুলোকে এই সময় লজিক্যাল ক্যাটেগরি হিসেবে ব্যাখ্যা দেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৮৩৮ সালে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে আত্মচৈতন্যের এক উৎপাদন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৮৪০-৪১ এর দিকে বাউয়ের মুক্ত দার্শনিক আত্মচৈতন্যকে সমস্ত ধর্মীয় রূপের বিরোধী বলে মত জাহির করেন। তার রাজনৈতিক র‍্যাডিকাল চিন্তা এবং প্রজাতন্ত্রবাদ এই সময় জমাট বাঁধে। তিনি তখন ক্যাথলিকবাদের বিপরীতে রেস্টোরেশান শাসন এবং একতরফা ধর্মীয় চৈতন্যের মাঝে ব্যক্তিস্বার্থের গঠনগত অভিন্নতা দেখতে পান। বাইবেলের ওপর তার গবেষণাগুলোতে র‍্যাডিকাল ভাবনার রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক ছাপ সুস্পষ্ট। বাইবেলের সিনোপটিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি একতরফা খ্রিষ্টান মতাদর্শের বিরোধিতা করে বাইবেলের সুসমাচারগুলো তৎকালীন ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ বলে অভিহিত করেন। এখানে তিনি খ্রিষ্টান _ধর্ম_ এবং সামন্তবাদকে অভিন্ন বলে ঘোষণা করে আত্মচৈতন্যের স্বাধীনতা এবং সাম্যের সপক্ষে দাঁড়ান।

ধর্ম এবং সর্ববিলোপবাদী রাষ্ট্র, তাঁর মতে, একে অপরকে ঠেকা দিয়ে টিকিয়ে রাখে

আর বিচ্ছিন্নতা এবং নির্যাতনকে সমান মাপে উৎসাহিত করে। খ্রিষ্টান ধর্ম ধর্মীয় চেতনাকে শুদ্ধ অমূর্ততায় উপস্থাপন করে আর তার সাথে সমস্ত নৈতিক বন্ধনকে একসাথে মিলায়ে ফেলে। তিনি বলেন, ইহুদি ধর্মে প্রকৃতি ধর্মীয় স্বার্থের অধীনস্ত হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও জ্ঞাতিবোধ এবং নির্দিষ্ট গোত্র টিকিয়ে রাখে। কেবল খ্রিষ্টান ধর্মেই এই ব্যাপারটি শুদ্ধ অমূর্ত সত্ত্বার স্বার্থে দূর করা হয়। ফলে বিচ্ছিন্নতা এখানে নিখুঁত রূপ পায় এবং তার বস্তুগত সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাউয়ের পঞ্চম ফ্রেডরিখ উইলিয়ামের খ্রিষ্টীয় রাষ্ট্র এবং উদার সাংবিধানিকতাবাদ দুটোই খারিজ করেন। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা উল্লিখিত হয় ধর্মীয় বা অর্থনীতির মতো ব্যক্তি স্বার্থে। হেগেলের মুক্তি সম্পর্কিত ধারণা এসব উদারনৈতিক মতামত হতে অনেক অগ্রসর। মুক্ত রাষ্ট্রের জন্য নৈতিক আত্মচৈতন্য দ্বারা খণ্ডিত অহংবাদের বিনাশ হচ্ছে পূর্বশর্ত।

১৮৪২ এবং ১৮৪৩-এ লেখা তার 'ইহুদি প্রশ্ন' এবং 'বর্তমানকালের ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের মুক্ত হবার সামর্থ্য' নামে দুটি রচনায় ধর্মীয় চৈতন্য এবং রাজনৈতিক সংস্কারের পর্যালোচনা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। এগুলো প্রকাশ হবার পর বাউয়ের বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের পদটি হারান। কারণ তিনি এর একটি কেন্দ্রীয় দাবিকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। প্রশ্নটি ছিল, প্রুশিয়ার খ্রিষ্টান রাষ্ট্র নাগরিক সব প্রতিষ্ঠানে ইহুদিদের অংশগ্রহণের উপরে নিষেধাজ্ঞা দূর করতে পারবে কিনা। উদারনৈতিক এবং প্রজাতন্ত্রীরা ইহুদি মুক্তির ওকালতি করতেন, বিপরীতে সংরক্ষণবাদীরা এ বিষয়ে রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতাকে সমর্থন করতেন।

বাউয়ের রাষ্ট্রকে তার বিশেষ ধর্মীয় সুবিধা দেয়ার জন্য আক্রমণ করেন, বলেন, রাষ্ট্র অধীনস্ততার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ধর্মকে মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করছে। অপরদিকে তিনি ইহুদিবাদের সমালোচনা করেন বিশেষ পরিচয়ের দাবিতে মুক্তি চাওয়ার জন্য। রাজনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির জন্য দরকার অতীতের সাথে সমস্ত খণ্ডিত সম্পর্কের বিনাশ। ফলে সমানতার জন্য ইহুদিদেরকে অবশ্যই তাদের সমস্ত ধর্মীয় দেমাগ পরিত্যাগ করতে হবে, খ্রিষ্টানদেরও। খ্রিষ্টান ধর্ম ঐতিহাসিকভাবেই চৈতন্যের এক ধাপ উঁচু স্তর ধারণ করে। কারণ এখানে দেবতার বাহ্যিকতা অস্বীকৃত হয়েছে। খ্রিষ্টান ধর্ম তার র‍্যাডিকাল এই অস্বীকৃতির জন্যই এক ধাপ এগিয়ে। এর সম্যক প্রয়োজন হচ্ছে নতুন এবং উচ্চতর এক নৈতিক জীবন। আত্মনির্ধারণ এবং আত্ম-অবমাননার দ্বন্দ্বের চর্চার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মে মুক্তির যুগান্তকারী ক্ষণ এসে উপস্থিত। বহু সমালোচনার পরও বাউয়ের তার এই মতামতের ব্যাপারে অনড় থাকেন।

ফরাসি বিপ্লব নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি জনসমাজের অভ্যুদয় লক্ষ্য করেন। বিপ্লবের দ্বারা সামন্ত জমিদারীগুলো উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে নিখুঁত টুকরো টুকরো বৈশিষ্ট্যের সমাজ গড়ে উঠছে, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারের জন্য দাবি-দাওয়া। এই ব্যক্তিক অর্থনীতিক স্বার্থ বহাল শাসনব্যবস্থার পুরোপুরিভাবে উচ্ছেদ সম্ভব হতে দিচ্ছে না। এর ফলেই চূড়ান্ত বিচারে বিপ্লব ব্যর্থ হলো। তাঁর মতে, প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া মিলিয়ে জনগণের বহাল ব্যবস্থার বিরোধিতা গভীরে যেতে পারেনি। উদারবাদী সাংবিধানিকতাবাদ,

সামন্ত জামানার সঙ্গে আপোসমূলক মনোভাব পোষণ করে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও তার মতে শ্রমিকদের রূপান্তর না ঘটিয়ে শুধু প্রত্যক্ষ, বিশেষ অস্তিত্বেই তাদের সংঘটিত করতে চায়। প্রলেতারিয়েতকে তিনি দেখতেন একটা শুদ্ধ বিশেষতা হিসেবে, বলতেন সেও যদি নিজের অংশগত স্বার্থ প্রথমে পরিত্যাগ না করে তাহলে নিজেকে খাঁটি সার্বিক হিসেবে রূপান্তর করতে পারবে না। একদিকে তিনি অযৌক্তিক প্রতিযোগিতামূলক রূপের জন্য পুঁজিতন্ত্রকে সমালোচনা করতেন আবার প্রগতির শর্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং মুক্ত আত্মনির্ধারণের খাতিরে প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করতেন।

১৮৪৮-এ বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা তাঁর মতে, য়ুরোপীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের দেউলিয়াপনাই প্রকাশ করে। জীবনের বাকিটা কাল তিনি প্রজাতন্ত্রবাদের বিজয়ের বদলে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের আগমনের ছায়া দেখেই কাটিয়ে গিয়েছেন।

বাউয়ের বলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার পতন হয়তো ঐতিহ্যগত সব আঙ্গিক, মূল্যবোধ হতে মুক্তির মাধ্যমে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। একই সাথে পরিত্যক্ত হবে এই সভ্যতার সব অধিবিদ্যা এবং ধর্মীয় স্বীকার-স্বীকৃতিগুলো পরিত্যাক্ত হবে। বাউয়েরের উদারতাবাদের বিরোধিতা এই সময় থেকে রক্ষণশীল মতামতের পেছনে সমর্থন যোগাতে থাকে। নিটশের মতো তিনিও সব ঐতিহ্য এবং ধর্মকে খারিজ করতে থাকেন। ১৮৪৮-এর বিপ্লব প্রচেষ্টা বাউয়েরের কাছে মনে হয়েছিল এনলাইটেনমেন্ট, কান্ট ও হেগেলের প্রস্তাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এর ব্যর্থতা মানে পাশ্চাত্য দর্শনের সুদীর্ঘকালের প্রকল্পগুলোর মৃত্যুঘণ্টা, যার পরে আর যৌক্তিক ব্যক্তি আত্মসার্বভৌমত্ব সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

১৮৪৮-এর ধাক্কার পর অনেক বুদ্ধিজীবীর মতোই বাউয়েরও অধিবিদ্যাকে পরিত্যাগ করলেন। এরপর পর্যালোচনার পদ্ধতিকে তিনি পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধানের ধারণা দিয়ে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করেন। ইতিহাস যে ক্রমাগত অনাবৃত হতে থাকা আত্মচৈতন্যের দ্বন্দ্ব এই বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেন। বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবশ্যই সমস্ত সামাজিক বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বা আবেগ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এই নতুন পর্যালোচনার উপসংহার হলো, ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রীদেরও নয় বিচ্ছিন্ন জনগণেরও নয়, বরং বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদের। এই সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠবে দুটো পরস্পরবিরোধী শিবিরের দ্বন্দ্বের মাঝ দিয়ে। একদিকে পশ্চিম ইউরোপীয় আঙ্গিক, অপরদিকে নবজাগ্রত রুশ আঙ্গিক। এই দ্বন্দ্ব য়ুরোপ ছাপিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। এই প্রক্রিয়ার শেষ হলো নিখাদ জনসমাজ, যা গড়ে উঠবে এই যুদ্ধের আগুনে পোড়া সমস্ত জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি বা খণ্ডিত স্বার্থ হতে।

এই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ খ্রিষ্ট-জর্মন ব্যবস্থার পতন ঘটাবে যার স্বপ্ন বাউয়ের প্রথম থেকেই দেখে আসছেন। কেবল তখনই সম্ভব হবে নতুন সংস্কৃতির উন্মেষ, থাকবে না ধর্মীয় বা আধিবিদ্যক মায়া।

শেষ বয়সে বাউয়ের প্রায়শ তরুণ ফ্রেডরিখ নিটশের দেখা পেতেন। বাউয়ের নিটশের ডেভিড স্ট্রসকে আক্রমণের ধারা দেখে খুব আমোদ পেতেন, নিটশে তাকে বলতেন, "আমার সব পড়ুয়া মানুষ"। এই ছিল বাউয়েরের সর্বশেষ বড় কাজ।

মন বা চৈতন্য (Mind or Consciousness)

মন চৈতন্যের সমার্থক, তবে প্রায়ই তাকে আলাদা ভাবে সব _মরমের_ সারকথা বা মানবউত্তীর্ণ অস্তিত্ববোধক হিসেবে ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। হেগেল 'অধিকারের দর্শনে' বলছেন, " মনের ইতিহাস তার নিজেরই কাজ। মন যা করে সে কেবল তাই, আর তার কাজ হলো নিজেকে নিজেরই চৈতন্যের বিষয় বানানো। ইতিহাসে এর কাজ হলো মন হিসেবে নিজেকেই জেনে ওঠা, যাতে সে নিজের কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেকে অনুধাবন করতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৩৪৩)

চৈতন্য হলো ব্যক্তির নিজ, পরিবেশ এবং চিন্তা সম্পর্কে সচেতনতা। ফলে একে সব দর্শনের মূল ভিত্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। চৈতন্যের বাইরে যা আছে তা কোনো না কোনোভাবে চৈতন্যে প্রতিফলিত হয়।

তাই দর্শনের সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন হলো বাইরের দুনিয়া আর চৈতন্য সম্পর্ক নিয়ে। পশ্চিমা জগতে চৈতন্যের সাথে বস্তুর সম্পর্ক বিবেচনায় (দেকার্ত) প্রশ্ন উঠেছিল—কেমন করে চৈতন্যের পক্ষে বস্তুজগৎ প্রতিফলিত করা সম্ভব? তারপর ৪০০ বছর এই ছিল পশ্চিমা দর্শনের প্রাণের প্রশ্ন।

চৈতন্যের স্বভাব বুঝতে হেগেল চৈতন্যকে _বিষয়_ বলে বর্ণনা করে বলেন যে, মানুষ তার সামাজিক সম্পর্কে অংশগ্রহণের মাধ্যমে চৈতন্য অর্জন করে। হেগেলের পদ্ধতিতে চৈতন্য _বিষয়ীগত_ মরমের বিকাশের মধ্যে থাকে - আত্মা (অচেতন মানসিক ক্রিয়া) → চৈতন্য → মরম (আত্মা ও চৈতন্যের ঐক্য)। চৈতন্যের ধাপ হলো সাধারণ চৈতন্য, আত্মচৈতন্য ও বুদ্ধি।

১৮৪০ সালের দিকে হেগেলের এই মত বহুমুখী তোপের মুখে পড়ে। মূলধারা পাশ্চাত্য দর্শন হেগেলের বিষয়গত ভাববাদ খারিজ করে চৈতন্যের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যক্তিবাদী, বিষয়ীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নেয়। মার্কস কিন্তু হেগেলের সমাজ-ঐতিহাসিক চৈতন্য সম্পর্কিত ধারণা সমর্থন করে গেছেন, কিন্তু চৈতন্যের _আঙ্গিককে_ কোনো ঈশ্বরের কাজ না বলে বলেছেন, মানুষের নিজস্ব সমাজচর্চা ও পরিবেশের সৃষ্টি।

মার্কস সিদ্ধান্ত টানেন—মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, তাদের সামাজিক অস্তিত্ব তাদের চৈতন্য নির্ধারণ করে। (দেখুন—A Contribution to the Critique of Political Economy'র মুখবন্ধ। মার্কস-এঙ্গেলস: *জর্মন ভাবাদর্শ*, প্রথম অংশ।)

মরম (Spirit)

জর্মন ভাষায় Geist, যার অনুবাদ মরম, মন, জগত মানস, পরম ভাব এমনকি ঈশ্বর পর্যন্ত হতে পারে। এই ধারণাটি নিখাদ হেগেলীয়। এখানে এই শব্দ বৈচিত্রও তাঁর দার্শনিক বীক্ষা অনুযায়ী করা হয়েছে। মরম বলতে হেগেল বোঝাতেন কোনো এক প্রকারের নীতিগত প্রক্রিয়া অনুযায়ী জিনিসের পরম্পরার এবং ঘটনাগুলোর একের পর আরেকটি ঘটনার যৌক্তিকতার ভাব। এই যৌক্তিকতার ভাবটিই হেগেল-এর মতে 'মরম'। তিনি মরমকে

মানুষের শ্রমের সৃষ্টি না বলে মানুষের সমস্ত সৃষ্টি, তার ইতিহাসকে মরমের প্রকাশ বলতেন।

এই মরম এমন কোনো একতরফা ঘটনার সমাহার নয় যাতে সবাই একই রকম ভাবে এগোয়। এতে বরং বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট সমাজে নির্দিষ্ট ভাষা, সংস্কৃতি বা ধারণার আওতায় প্রতিটি বাদ-বিসম্বাদ, প্রতিটি ঝামেলা একে অপরের সাথে লড়াই করেই ফয়সলায় আসা। মরমের মাঝের এই সত্য, প্রতিটি ঝামেলার মাঝে লুকিয়ে থাকা এই অকথিত চুক্তি এসবের বিষয়ী 'মানুষের' পেছন হতে, তাদের অজান্তেই কাজ করে। হেগেল এমনই বলতেন।

মানব এবং নাগরিকদের অধিকার ঘোষণা (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)

ফরাসি La Declaration desdroits de I'Homme et du। এটি ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম একটি মৌলিক দলিল, এখানে জনগণের একগুচ্ছ স্বতন্ত্র এবং সমন্বিতের অধিকার বর্ণনা করা আছে। গৃহীত হয় ১৭৮৯-এর ২৬ আগস্ট, জাতীয় সংসদের অ্যাসেম্বলিতে সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে। এতে গৃহীত অধিকারগুলো শুধু ফরাসি নাগরিকদের জন্য নয় বরং সমস্ত মানুষের জন্যই ঘোষণা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

ঘোষণার খসড়া তৈরি করেন মার্কুই লাফায়েত। এটি ছিল পরম রাজতন্ত্র সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে উত্তরণের দিকে যাওয়ার সময়। এতে উল্লিখিত অধিকাংশ অধিকারই বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরোধী। পরে ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র রূপ পাওয়ার পরেও দলিলটি মৌলিকরূপেই স্বীকৃত হয়। ঘোষণার মূলনীতিগুলো এনলাইটেনমেন্টের কালের দার্শনিক এবং রাজনৈতিক নীতি, জ্যাঁ জ্যাক রুশোর সামাজিক চুক্তি এবং ব্যরন দ্য মতেস্কুর ক্ষমতার বিচ্ছিন্নকরণের তত্ত্ব হতে নেয়া। পাঠ করলে দেখা যাবে, এই দলিলটি মূলত ১৭৭৬-এর ৪ জুলাই গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার মানব অধিকার ঘোষণারই প্রতিলিপি, তার সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে ১৭৭৬-এর জুনের জর্জ ম্যাসনের তৈরি করা ভার্জিনিয়ার অধিকার ঘোষণার, যা আবার গড়ে উঠেছিল ১৬৮৯ সালের ইংল্যান্ডের বিল অব রাইটসের ওপর ভিত্তি করে।

মুক্তি/স্বাধীনতা (Freedom)

মুক্তি/স্বাধীনতা হলো জনগণের নিজেদের কাজ-কারবার নির্ধারণের অধিকার ও সামর্থ্য। এটি ঘটে এমন *সম্প্রদায়ে* যা মানব সম্ভাবনার সম্পূর্ণ *বিকাশের* শর্তাদি যোগান দিতে পারে। মুক্তি/স্বাধীনতা ব্যক্তি উপভোগ করতে পারে কেবল সম্প্রদায়ের মাঝে, সম্প্রদায়ের মাধ্যমে।

"কেবল সম্প্রদায়ের মাঝে প্রত্যেক *স্বতন্ত্রের* তার যোগ্যতা সব দিকে চর্চার উপায় আছে; আর তাই কেবল সম্প্রদায়ের মাঝেই ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্ভব। অতীতের সম্প্রদায় বিকল্পসমূহে, *রাষ্ট্র*, ইত্যাদিতে ব্যক্তি মুক্তি ছিল কেবল শাসকশ্রেণীর সম্পর্কের মাঝে বেড়ে ওঠা স্বতন্ত্রদের জন্য, আর তার ব্যাপ্তি ছিল ঐ শ্রেণীর স্বতন্ত্র পর্যন্ত। (মার্কস-এঙ্গেলস, জর্মন ভাবাদর্শ, অধ্যায় ১, খ)

বুর্জোয়া সমাজে স্বাধীনতা অর্থ দিয়ে পরিমাপযোগ্য, হরেক রকমের স্বাধীনতা/মুক্তি একটা আরেকটা থেকে কম বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। যেমন ব্যবসার স্বাধীনতা মানে শুধুই ব্যবসার স্বাধীনতা, তার সাথে অন্যসব স্বাধীনতার কোনো যোগসাজশ নেই। প্রতিটি স্বাধীনতার বিশেষ বলয় ঐ বলয়েরই স্বাধীনতা, যেমন করে জীবনের প্রতিটি বিশেষ ধরন বিশেষ প্রকৃতির জীবনের ধরন।

যেসুইট

ল্যাটিন Societes Iesu (Socity of Jesus), যীশু সঙ্ঘ-রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি খৃষ্টিয় ধর্ম সম্প্রদায়। এই সঙ্ঘের সদস্যদের যেসুইট বলা হয়।

১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনের বাস্ক্ জাতভুক্ত লয়োলা'র ইগনেশিয়াসের উদ্যোগে দারিদ্র্য আর চারিত্রিক শুদ্ধতায় ব্রত নিয়ে পোপের নিরঙ্কুশ বশ্যতা মেনে এই যিশু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকে তারা তিনটি কাজে মনোযোগ দেয়–য়ুরোপ জুড়ে স্কুল স্থাপন, অখ্রিষ্টানদের দীক্ষিত করা আর প্রোটেস্টান্ট প্রসার থামানো।

ইগনেশিয়াসের মূল নীতি ছিল Ad Miorem Dei Gloriam-ঈশ্বরের অধিকতর মহিমা। মানে, অশুভ নয় এমন যে কোনো কাজ, উদ্দেশ্য নির্ভর হলে আধ্যাত্ম্য জীবন উন্নয়নে কাজে লাগে।

রোমান চার্চের প্রশ্নহীন বশ্যতা মেনে নিয়ে তারা চার্চের দুর্নীতি, সম্পদ জমা করার প্রবণতার বিরুদ্ধে সংস্কার চাইতেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, চার্চের সংস্কার শুরু হবে ব্যক্তির মন পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ভিন্ন ধর্মসমূহের মত বিনিময় প্রসারে যেসুইটরা উদ্যোমী।

রাজনীতি (Politics)

রাজনীতি হলো *সম্প্রদায়ের চৈতন্য* পরিবর্তনকেন্দ্রিক কাজ-কারবার যা সম্প্রদায়ের নিছক প্রতিদিনকার ক্রিয়ার সরলতার নির্যাসস্বরূপ। রাজনীতির *বিজ্ঞান* নিয়ে বহু আগে আলোচনা করে গেছেন কনফুশিয়াস, এ বিষয়ে প্রথম কেতাবি য়ুরোপীয় রচনা পাওয়া গেছে প্লেটোর লেখা 'রিপাবলিক'। তাঁর ছাত্র এরিস্তোতল বিভিন্ন রকমের সংবিধান ও *রাষ্ট্রকে* শ্রেণী ভাগ করেন, রাজনীতিবিদদের পরামর্শ দেন সুখ পরিপোষণে নৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করতে।

সামন্ত সমাজে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে রাজনীতি ও শ্রমের কোনো বাস্তব তফাৎ ছিল না। সমস্ত সমাজ ছিল রাজনৈতিক জগতের আবেষ্টনের ভেতর, সমাজের কে কোথায়, কোন অবস্থানে শ্রম দেবে তা নির্ভর করতো রাজনৈতিক ধারাক্রমে তার অবস্থান অনুযায়ী। রাজনীতি সেখানে উচ্চশ্রেণীর কাজ, বাকিরা তাদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকা পালন করবে। শাসন চালানোর কাজই সেখানে রাজনীতি। এই পর্যায়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের বিকাশ নিয়ে লেখা বই হলো নিকোলো মেকিয়াভেলির 'দি

প্রিন্স'। তাঁর এবং কনফুশিয়াসের মূল প্রতিপাদ্য হলো—যে কোনো মূল্যে স্থিতিশীলতা।

বুর্জোয়া সমাজের উত্থানের সাথে *রাষ্ট্র* ও পরিবারের বাইরে ছড়িয়ে পড়া কাজ-কারবারের জন্য নৈতিক ও রাজনৈতিক জমিন সৃষ্টি প্রয়োজন হলো। টমাস হবস বুর্জোয়া সমাজের মাঝে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের লড়াই রুখতে বা এড়াতে রাষ্ট্রকে মনে করতেন অনিবার্য; জন লক ইংরাজ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা বিকাশ করলেন; রুশো স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঠেকাতে "সামাজিক চুক্তি" ধারণা বিকশিত করলেন। অপরদিকে হেগেল জন্ম দিলেন 'অধিকারের দর্শন', যেখানে মার্কসের মতে, "এক পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমাজ" চালিত হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের হাতে; টমাস পেইন তদবির করলেন 'মানব অধিকারের' সপক্ষে।

আধুনিককালে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হলো রাজনৈতিক দল, যেখানে সামাজিক স্বার্থ সংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক আঙ্গিক পায়। কথিত পোস্ট-মডার্ন যুগে কেউ কেউ বিশ্বায়নের মুখোমুখি কার্যকর শক্তির ভরকেন্দ্র বা আধার হিসেবে রাষ্ট্র বা সরকারকে মানতে নারাজ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক আন্দোলনের বিপরীতে তারা *সম্প্রদায়* ধারণা খেলাফ করে আত্ম-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

রাজনৈতিক বিপ্লব (Political Revolution)

রাজনৈতিক বিপ্লব হলো বহাল শাসক রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে ব্যাপক জনআন্দোলন দিয়ে শক্তির সাহায্যে ছুঁড়ে ফেলা। এর উদ্দেশ্য অন্তর্গত উৎপাদন সম্পর্ক পাল্টানো বা *রাষ্ট্র* বিলুপ্ত করা নয়।

রোবোসপিয়ের, ম্যাক্সিমিলিয়েন ফ্রাসোয়াঁ মারি ইসিদোরো দ্য

৬ মে ১৭৫৮-২৮ জুলাই ১৭৯৪। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম নেতা। বিপ্লবের প্রতি আমৃত্যু বিশ্বস্ত। জননিরাপত্তা কমিটির খুবই প্রভাবশালী নেতা। এই কমিটি বিপ্লবীদের শক্তি সুসংহত করবার কালে মূল ক্ষমতায় ছিল, এই সময়কে সাধারণভাবে 'ত্রাসের রাজত্ব' বলা হয়। বিপ্লবী পঞ্জিকার দ্বিতীয় বছরে তিনি নিহত হন।

রাজনৈতিকভাবে ছিলেন এনলাইটেনমেন্টের অন্যান্য দার্শনিকদের মাঝে বিশেষ করে জ্যাঁ জ্যাক রুশোর শিষ্য। বামপন্থী বুর্জোয়া মতের যোগ্য প্রচারক। বিদ্রোহ সংগঠনে তার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। যতটা ভালো তাত্ত্বিক তত ভালো প্রশাসক তিনি ছিলেন না। সহিংসতাকে তিনি জননিরাপত্তা অর্জনের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন।

সদৃশ (Semblence)

সদৃশ হলো মায়ার সমার্থক, জর্মনে বলা হয় Schein বা প্রদর্শন। মায়া হলো হেগেলীয় দর্শনের এক ক্যাটেগরি, এতে বোঝায় কোনো বিষয় প্রথম ধারণায় যে সন্দেহ জাগায়—সেই ক্ষণ।

সমালোচনা, পর্যালোচনা (Criticism)

কোনো আলোচনার ভেতরে থাকা মূল বিষয়টিকে বের করে আনবার চর্চাকে পর্যালোচনা বলে।

কোনো বিষয় বা আলোচনাকে ভিন্ন জায়গা হতে বিশ্লেষণ বা তা ভুল প্রমাণের চেষ্টা হতে পর্যালোচনার তফাৎ আছে। আদতে এখানে ধরে নেয়া হয়, যে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে তার মাঝে সঠিকতা আছে, তবে সেই বিশেষ সামাজিক স্বার্থটি সম্পূর্ণ ওজন নিয়ে ঘোষিত হচ্ছে না।

পশ্চিমে এর শুরু হয় কান্টের শুদ্ধবুদ্ধির পর্যালোচনা দিয়ে। কান্টের মতে, সমালোচনা হচ্ছে অন্ধ মত আর সন্দেহবাদের মাঝের পথ। কোনো বিবৃতি সত্য না মিথ্যা—কান্ট সোজাসাপ্টা তার সিদ্ধান্ত নেয়ার বদলে এর ক্যাটেগরিগুলো, যে ধারণা দিয়ে প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয় সেগুলোই বিশ্লেষণ করতেন।

হেগেল প্রথম সমালোচনা/পর্যালোচনা গঠনগতভাবে গড়ে তোলেন। তিনি কোনো বিষয়ের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলো কিভাবে নিজের লজিক অনুযায়ী নিজেরই বিপরীত অবস্থানে যেতে পারে তা শেখান। *তরুণ হেগেলীয়রা* নিজেদের সমালোচক বলতো। এ প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের 'পবিত্র পরিবার' দেখুন। তরুণ হেগেলীয়দের লুডভিগ ফয়েরবাখ হেগেলের বিরুদ্ধেই এক সমালোচনার ধারা বিকাশ ঘটান। তিনি হেগেলের বাক্য হতে উদ্ধৃতি নিয়ে তার উদ্দেশ্য আর বিধেয় পরস্পর বদলে দেখান যে এভাবে হেগেলের বলা কথা আরো বহু অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, খ্রিষ্টানরা বলে জাগতিক পরিবার আসলে দৈবী পরিবারের ছায়ামাত্র, সেখানে ফয়েরবাখ দেখান ঐ দৈবী পরিবার আসলে জাগতিক পরিবারের কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি।

হেগেলের অধিকার দর্শনের পর্যালোচনায় মার্কস ফয়েরবাখের এই পদ্ধতি কাজে লাগান। পরে মার্কস এই পদ্ধতির ঘাটতি নিয়ে বলেন:

"তাই ফয়েরবাখ দেখতে পান না যে, 'ধর্মীয় অনুভূতি নিজেই হলো একটা সামাজিক সৃষ্টি এবং যে বিমূর্ত ব্যক্তিটির বিশ্লেষণ তিনি করেন সেও প্রকৃতপক্ষে কোনো একটা নির্দিষ্ট রূপের সমাজের অন্তর্ভুক্ত।" (মার্কস, ফয়েরবাখ সম্বন্ধে ৮ম থিসিস)

এমনি করে মার্কস হেগেলের পর্যালোচনা হতে মূল্যবান এক ব্যাপার বের করলেন। তাঁর মতে, ধারণা ও তত্ত্ব 'বিশেষ রূপের সমাজে'র মাঝে তাদের স্বার্থ প্রকাশ করে। ভাবাদর্শের ভেতরে, সমাজ সম্পর্ক লুকিয়ে থাকে, যা ধরলে ভাবাদর্শকে বোঝা যায়, তবে একই কালে ভাবাদর্শই সমাজ সম্পর্ক বোঝায় সবচেয়ে ভালো খোলা পথ।

মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থটিকে পর্যালোচনাই বলেছেন। মার্কসের পর্যালোচনা জ্যাক দেরিদার পর্যালোচনা হতে ভিন্ন। তাঁর পদ্ধতি 'অবিনির্মাণ' (Deconstruction) নামে পরিচিত। পদ্ধতিটি হলো কোনো তর্কের ভেতর হতে লুকোনো বাইনারিটি প্রকাশ করে তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা। দেখানো যায় যে প্রতিটি আর্গুমেন্টেই এমন

অকথিত বাইনারি আছে, ফলে কোনো টেক্সটের বাইরে না গিয়েই সেখানে অবিনির্মাণের প্রক্রিয়া চালানো যায়। মার্কসের মতে, টেক্সটে বলা, প্রকাশিত আর্গুমেন্ট ও তার সামাজিক শর্ত অবিচ্ছেদ্য।

সম্প্রদায় (Community)

সম্প্রদায় হলো শ্রমের নির্দিষ্ট সামাজিক বিভাগের মাধ্যমে সাধারণ বৈধ-অবৈধতার ধারণা মেনে একসাথে বেঁচে থাকা মানুষের দল। একে এক নৈতিক মূল্যবোধ বলা যায়।

নিজেকে নিজে শাসন করতে পারা সম্প্রদায় ধারণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিচারে মানবতার জন্য সম্প্রদায় ধারণাটি ফেলনা নয়। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় *বুর্জোয়া* শ্রেণী সামাজিক উৎপাদন মাধ্যমের শ্রেণীগত দখলদারি কায়েম করে, সম্প্রদায়ে একত্রিত উৎপাদন করবার শক্তিকে ব্যবহার করে তাদের সম্পত্তির মতো করে। এর ফলে সম্প্রদায়গত আস্থা ভেঙে পড়ে, অসংখ্য রেশারেশির জন্ম নেয় মানুষের বিভিন্ন দলের মাঝে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্তমানে সম্প্রদায় ধারণাটি শাসন করছে:

১. "উপাদনী উপায়ের মুষ্টিমেয় হাতে জমা হয়ে যাওয়া, যার ফলে তাদের আর সরাসরি শ্রমদাতার সম্পত্তি বলে মনে হয় না এবং তা সামাজিক উৎপাদনী ক্ষমতায় বদলে যায়। যদিও শুরুতে তা পুঁজিপতিদের ব্যক্তিসম্পত্তি, কিন্তু আসলে তা বুর্জোয়া সমাজের আমানতদারি, কিন্তু এই আমানত সব ফল তারাই পকেটস্থ করে।"

২. "শ্রমের সংগঠন নিজে সামাজিক শ্রম হয়ে যায় পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রম বিভাগ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে শ্রমকে একত্রিত করবার মাধ্যমে।"
"এই দুই দৃষ্টিতে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ধরন ব্যক্তিসম্পত্তি এবং ব্যক্তি শ্রম, পরস্পরবিরোধী আঙ্গিকে হলেও, উচ্ছেদ করে।

৩. "বিশ্ববাজারের সৃষ্টি।"
(মার্কস: *পুঁজি*, ৩য় খণ্ড)

সার্বিক (Universal)

জগতের সমস্ত জিনিসে সাধারণ কোনো গুণ আর নীতি উপস্থিত যা সর্বদা আর সবসময় সত্য–জ্ঞান তত্ত্বে এমনি করেই সার্বিককে চেনানো হয়।

সার্বিক কেবল স্বতন্ত্রের মাঝ দিয়েই থাকতে পারে। মানে এমন বিষয়ের অস্তিত্ব যার মাঝে সার্বিক গুণ উপস্থিত। যেমন, জাম (স্বতন্ত্র) কাল (সার্বিক)। মানব সত্তার হাতে কলমের কাজ এবং তার ওপর ভিত্তি করা জ্ঞানগত ক্রিয়া ছাড়া সার্বিকের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সার্বিকের আসলেও কোনো বিষয়গত ভিত্তি আছে কিনা তা দেখানো সম্ভব কেবল চর্চার মাধ্যমে।

সামন্ত সমাজ (Feudal Society)

সামন্ত সমাজ হলো এমন এক ধরনের সভ্যতা যা সাধারণত ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র মাপের কৃষি উৎপাদনের সাথে সমন্বিত, যার ভিত্তি প্রথাগত গঠনের ভূমি মালিকানা, যেখানে সমাজের প্রতিটি সদস্যের অধিকার এবং কর্তব্য ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত।

সামন্ত সমাজ একটি শ্রেণী সমাজ। এখানে বিভিন্ন পরিবার অসম অধিকার এবং কর্তব্য পালন করে, ভূমি, সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা পূর্বতন প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হয়। এ সমাজে খুব নিম্নমাত্রায় হলেও প্রতিটি শ্রেণীরই কিছু অধিকার থাকে। এই সমাজে দাসত্ব থাকলেও তা উৎপাদনের প্রধান ধরন হয় না।

জমিতে সংযুক্ত সাধারণ জনগণই এখানে প্রধান উৎপাদক, তার কিছু সুচিহ্নিত রাজনৈতিক এবং ভূমিগত অধিকার থাকে। দাস সমাজের মতো রাজা এখানে নিজেই আইন নন, তাকে এবং তাঁর অভিজাতদেরকে সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য অনুযায়ী চলতে হয়। *বুর্জোয়া* সমাজের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো—বুর্জোয়া সমাজ ঐতিহ্যগত অধিকার এবং নীতিবোধের আরোপিত বাধার বাইরে গিয়ে শুধুই মুনাফা অর্থাৎ *'বাজার'* দ্বারা শাসিত হয়।

সামন্ত সমাজে রাষ্ট্র সমাজের ওপরে অবস্থিত কোনো শক্তি হিসেবে নিজেকে জাহির করে না, বরং নিজেকে সমাজের সঙ্গে অভিন্ন হিসেবেই প্রকাশ করে। *বুর্জোয়া* সমাজের তুলনায় সামন্ত সমাজের *ধর্মীয়* ধারণাতেও তফাৎ থাকে। দাস সমাজের শাসক হতেন নিজেই আধা-ঈশ্বর আর সামন্ত সমাজে রাজা মোটামুটিভাবে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এখানে সমস্ত সিদ্ধান্তই আধিপত্যমূলক। ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা অকল্পনীয়, তবে প্রতিটি ব্যক্তি ঐ আধিপত্যশীল সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট অধিকার ধারণ করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে সামন্ত সমাজ হলো ক্ষুদ্র মাপের কৃষিভিত্তিক উৎপাদনী শক্তির জন্য লাগসই উৎপাদনের ধরন। ক্ষুদ্র মাপের কৃষি হতে সর্বোচ্চ সুবিধা নেয়ার স্বার্থে এখানে শ্রমদাতাকে জমির ওপরে অধিকার দেয়া হয়। কৃষক এখানে জানে সামন্ত সমাজের উপরিকাঠামো টিকিয়ে রাখতে কি অনুপাতে তার শ্রম ব্যয় হয়, কারণ তার শ্রমের বা উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট অংশই সরাসরি তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়। অপর দিকে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মজুরি শ্রমিক এই পরিমাণটি না জেনেই শোষিত হয়, কারণ তার মনে হয় প্রতিটি শ্রম-ঘণ্টার জন্যই সে মজুরি পাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বেড়ে উঠার ফলে এবং সামন্ত সমাজের এখতিয়ারের বাইরে বেড়ে উঠা পুঁজির দাপটে ধ্রুপদী পশ্চিমা সামন্ত সমাজের অবসান ঘটে।

প্রাসঙ্গিক পাঠ: ১. কমিউনিস্ট ইস্তেহার, ২য় অধ্যায়; ২. মার্কস: ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ২৬ অধ্যায়; ৩. এঙ্গেলস: পরিবার, ব্যক্তিসম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ৮ম অধ্যায়; ৪. মার্কস-এঙ্গেলস: জার্মান ভাবাদর্শের ১ম অধ্যায়।

সিভিল সমাজ

সিভিল সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, বিষয়টি যেভাবে আমাদের সমাজ-রাজনৈতিক চর্চায় প্রচিলত তার বৈশিষ্ট্য ও উৎস এবং দ্বিতীয়ত, সিভিল সমাজ ধারণার ঐতিহাসিক বিকাশ, প্রচলিত ধারণার সাথে তার উৎসগত যোগাযোগ এবং মার্ক্সীয় আলোচনায় ধারণাটির রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ রূপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লেষ।

'সুশীল সমাজ' তার্কিকরা একমত যে জ্ঞান আঞ্চলিক, ভিন্নতা ও ব্যবধানই আধুনিক সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়, মানব সম্পর্ক গড়ে ওঠে নিছক ভাষা ও ডিসকোর্সের মাধ্যমে আর লড়াইয়ের ময়দান অর্থনীতি-রাজনীতি নয় বরং সংস্কৃতি। রাষ্ট্র বা রাজনীতির সমগ্রতার বিপরীতে প্রস্তাবিত প্রতিপক্ষ হচ্ছে বহুধা বিভক্ত, আত্ম-পরিচয় নির্ধারিত একক। কিন্তু বিশ্বজোড়া সুশৃঙ্খল, সচেতন শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারের কাছে এই সব প্রস্তাবনা অসহায় হয়ে পড়ে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বাজারের অনুপ্রবেশ আর পুঁজির পুঞ্জিভবনের সর্বাত্মক লজিক প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র হতে সিভিল সমাজের আলাদা হওয়া মানুষকে সর্বগ্রাসী, অন্ধ বাজারের গ্রাসে ছুঁড়ে দেয়।

হাল আমলের সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তা জগতের সিভিল সমাজ সংক্রান্ত ধারণার দুটো ধরন পাওয়া যায়। উভয়েরই মূল উদার গণতন্ত্রী তত্ত্বে। এ ব্যাপারে প্রথম ধ্রুপদি বুর্জোয়া বোঝাপড়া দাঁড় করান এডাম স্মিথ। তাঁর কাছে এটা ছিল প্রয়োজনের বাজার সংগঠিত বলয় যা চালিত হয় ব্যক্তি মালিকদের আত্ম-স্বার্থের গতিতে। জন লকের কাছে সিভিল সমাজ ছিল সম্পত্তি, শ্রম, বিনিময় ও ভোগের সমন্বয়। লকের এই ধারণার কাছে স্মিথ ঋণী। এরপর বাজারের বিকাশ ঘটলো দ্রুত গতিতে। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা সিভিল সমাজকে তত্ত্বায়িত করলেন এমন এক স্বশাসিত স্বনিয়ন্ত্রিত, বলয় হিসেবে যা বিশেষ সুবিধার জন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে জনস্বার্থে রূপান্তরিত করতে পারে। হেগেল তাঁর রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের তত্ত্ব এই বোঝাপড়ার ওপরে ভর করেই দাঁড় করান।

অপর দিকে তকভিলের মতে সিভিল সমাজ হল স্বেচ্ছা সম্মিলনের এক অন্তর্বর্তী বলয় যা টিকে থাকে নিজেই সংগঠিত আর সহযোগিতার এক ইনফর্মাল সংস্কৃতির মাঝ দিয়ে।

এই দুই ধারণার সাথে স্থূল আরেকটা ধারা প্রচলিত আছে যারা বলে বেড়ায় যে আমাদের প্রত্যেকের মাঝে সুসম্পর্ক থাকা উচিত, রাজনীতিবিদদের সৎ, দুর্নীতিমুক্ত হওয়া উচিত, প্রচার মাধ্যম শুধু নেতিবাচক না হয়ে বাস্তব যেমনই হোক ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা উচিত... এই সব। এই ঘরানা রাজনীতিবিদ হতে জনগণ পর্যন্ত সবাইকে ন্যায়-নীতি, আচার ব্যবহার শিক্ষা দেয়।

এবার হেগেলের কাছে ফিরে যাওয়া যাক। তাঁর কাছে সিভিল সমাজ হলো প্রয়োজন দিয়ে গঠিত, রাষ্ট্র ও পরিবারের মধ্যস্থতায় বাজার সম্পর্কের নেটওয়ার্ক। কিন্তু নৈতিকতার বিচারে তাকে সর্বদাই আপোষ করতে হয়। কারণ এর গোড়ায় থাকা প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি দখলের প্রবণতা–এক সার্বিক বিশৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হওয়ার

আশঙ্কা থাকে। এই পরিস্থিতিতে ভাণ্ডার যত বড়ই হোক অভাব সব সময় তাড়া করে, প্রত্যেকে নিজেকেই সব'চে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে থাকে। এমন ঝামেলার সুরাহা করতে না পেরে সিভিল সমাজে প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের নৈতিকতার।

মার্ক্স জানতে চাইলেন-হেগেল রাষ্ট্রকে যে দায়িত্ব দিলেন সে তা পালন করতে সক্ষম কিনা! রাষ্ট্র তাঁর কাছে এক মিথ্যা সার্বিকতা। তিনি আরো বললেন যে, ব্যক্তিসম্পত্তি কেন্দ্রিক বস্তুগত স্বার্থের নেটওয়ার্কই এর গলদের মূল। ফরাসি বিপ্লব ধর্ম, সম্পত্তি, নৈতিকতা এ সবের ফর্মাল রাজনৈতিক মানে বদলে ব্যক্তি বিশেষের বৈশিষ্ট্যে বদলে দিল। কিন্তু এই বদল একই সঙ্গে প্রমাণ করলো যে রাষ্ট্রকে, ফর্মালভাবে সমাজ হতে মুক্ত করলে তার সাথে সমাজও রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি আমজনতার বিষয় ধর্ম বা সম্পত্তি দিয়ে ব্যাপকভাবে নির্ধারিত না হয় তবে ধর্ম বা সম্পত্তি রাজনৈতিক বাধা-নিষেধ ছাড়া বল্গাহীন ভাবে বেড়ে যেতে পারে। রাজনীতি হতে এগুলো মুক্ত হলে মানুষের ওপর তাদের প্রভাব কমে না বরং ফর্মাল রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা হতে মুক্তি তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সিভিল সমাজের এই আপাত স্বাধীনতার মানে, "মানুষকে বাধা-নিষেধ হতে মুক্ত না করেই রাষ্ট্র নিজেকে তা হতে মুক্ত করতে পারে। মানে মানুষকে মুক্ত না করেই রাষ্ট্র মুক্ত হতে পারে (মার্ক্স, ইহুদি প্রশ্নে)"। আরো লক্ষণীয় যে, রাজনৈতিক মুক্তির দৌড়ও সীমাবদ্ধ, "মানুষ ধর্ম হতে মুক্ত হল না, পেল ধর্মীয় স্বাধীনতা। সম্পত্তি হতে মুক্তি না পেয়ে পেল সম্পত্তির স্বাধীনতা। ব্যবসার অহং হতে মুক্ত না হয়ে পেল ব্যবসা করবার স্বাধীনতা (ঐ)।"

মুক্তির জন্য ধর্ম বা রাজনীতিতে পরিবর্তনের চাইতে বেশি কিছু দরকার। "রাজনৈতিক মুক্তি সন্দেহ নেই যে এক বিরাট অগ্রবর্তী পদক্ষেপ, সাধারণভাবে তা মানব মুক্তির চূড়ান্ত রূপ নয়, তবে একে বিদ্যমান জগত ব্যবস্থার ভেতরে মানব মুক্তির চূড়ান্ত রূপ বলা যায়। বলা বাহুল্য আমরা এখানে বাস্তব, প্রায়োগিক মুক্তির কথা বলছি (ঐ)। বুর্জোয়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র বাজারের সামাজিক ভিত্তিকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে দেয়। সমস্যার মূল হল ব্যক্তিসম্পত্তি। মার্ক্স-এঙ্গেলস এবার মনোযোগ দিলেন এমন সামাজিক শক্তির দিকে যা এই সমস্যাকে সমাধান করে বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থাকে পাল্টাতে পারে।

আগের সব সমাজ পর্যালোচকদের ঝোঁক ছিল খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে সবচে দূর্গত, নয়তো সব'চে বেশি পরিশ্রমি অথবা সব'চে শোষিতদের দিকে। মার্ক্স-এঙ্গেলস এই প্রবণতা চির তরে পাল্টে দিলেন আধুনিক জীবনের একেবারে কেন্দ্রে বাস করা সম্পত্তিহীন সর্বহারাদের দিকে মনোযোগ দিয়ে। এই সর্বহারা হল সিভিল সমাজের জলজ্যান্ত নেতিকরণ। মার্ক্স সমস্যার আরো স্পষ্ট করেন ফয়েরবাখের ওপর দশম থিসিসে, "পুরাতন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল 'সিভিল' সমাজ; নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ মানব সমাজ বা সমাজিকৃত মানব জাতি।"

তবে রাজনৈতিক বিপ্লবের সমালোচনা মানে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ নয়। 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে'র অন্যতম প্রতিপাদ্য হল সর্বহারা বিপ্লবে রাজনীতির ভূমিকা স্পষ্ট করা, আর এই বিপ্লবের প্রতিপাদ্য হল সমাজ রূপান্তর। বুর্জোয়াদের যদি প্রথমে

রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করা যায় তাহলেই তাদের অর্থনৈতিকভাবে পরাজিত করা যাবে–এই অবস্থান থেকে মার্ক্স এঙ্গেলস জানান যে, "কমিউনিস্টদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অন্যসব সর্বহারা পার্টির মতই, আর তা হল সর্বহারাদের শ্রেণী হিসেবে গঠন করা, বুর্জোয়া শ্রেষ্ঠত্বকে ছুঁড়ে ফেলা, প্রলেতারিয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা জিতে নেয়া (ইশতেহার)।"

রাজনৈতিক মুক্তির সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও মার্ক্স সমাজ রূপান্তরে রাজনীতির এমন অগ্রবর্তী ভূমিকা রাখার কারণ আছে। তাঁর মতে, প্রলেতায়িত বিপ্লব পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলো থেকে ভিন্ন হবে। সামন্ত সমাজের ভেতরে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কম বেশি আকার ধরে বেড়ে ওঠার পরই বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হয়। সামন্ত রাষ্ট্রকে খোলাখুলি বিপ্লবী ধাক্কা দেবার আগেই বুর্জোয়া সম্পত্তি ও উৎপাদন সামন্ত সম্পত্তি ও উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে প্রতিস্থাপিত করেছিলো। বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রধান কাজ ছিল অভিজাততন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব শেষ করে দেয়া। বুর্জোয়াদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা যাওয়ার আগেই বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কের মূল কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বুর্জোয়া বিপ্লব শুধু এক ক্ষয়ে যাওয়া উপরিকাঠামোকে ইতিমধ্যে রূপান্তরিত ভিত্তি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছিলো। এ কারণেই ইশতেহার উৎপাদনি মাধ্যমে ব্যক্তিসম্পত্তির কোন রূপকে তার চাইতে উন্নত কোন রূপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়ার রাজনৈতিক রূপান্তরের ধারাক্রমে বুর্জোয়া বিপ্লবকে সর্বশেষ বলেছে। পূর্বতন সমস্ত সমাজ বিপ্লবে ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তরের মূল সূত্র ছিল অভিন্ন। এ কারণেই ধ্রুপদি সমাজ বিকাশে সামন্ততন্ত্র বেড়ে ওঠে দাসতন্ত্র হতে, পুঁজিতন্ত্র সামন্ত ব্যবস্থার বস্তু আর সমাজ শর্ত হতে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তার সামাজিক ও বস্তুগত শর্ত সম্পন্ন হওয়ার আগেই শুরু হয়।

সর্বহারা বিপ্লবের চূড়ান্ত ফলাফল সমাজ বদল, তার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য রাজনৈতিক। মার্ক্সের প্রকল্পে এই প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র অবিকল্প গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই রাষ্ট্র ক্ষমতার সমগ্র লক্ষ্য হচ্ছে তার নিজেকে বিনাশ করবার পরিস্থিতি তৈরি করা। এই দ্বন্দ্ব বাস্তব রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বহু পুরাতন।

আজকালের সিভিল সমাজ নিয়ে যে হুজুগ তার সূত্রপাত ১৯৮০'র গোড়ার দিকে পূর্ব য়ুরোপে। সেখানকার কিছু বুদ্ধিজীবী সোভিয়েত স্টাইলের বহাল সমাজতান্ত্রিক সমস্যাগুলোকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজের বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেন। তাঁরা সিভিল সমাজকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সংগঠিত কমিউনিস্ট বিরোধিতা বলেই মনে করতেন। এই জমিনের ধারণা শীতল যুদ্ধের কালে পশ্চিম য়ুরোপে ও মার্কিন মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে বর্তমানে মূলস্রোতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রায় শাস্ত্রের মর্যাদা পেয়ে গেছে।

সারসত্ত্বা (Essence)

কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্য বা মানে। মধ্যযুগের পশ্চিমা দার্শনিকরা মনে করতেন সারসত্ত্বা কোনো জিনিসের গুপ্ত এক গুণ, যাকে কেবল বুদ্ধি বা বিশ্বাসের ক্ষমতা দিয়েই কবজা

করা যায়। কান্ট একে সব সংবেদনক্ষম উপাদান বর্জিত, নিজেই সর্বেসর্বা—এমন এক ধারণাতে গুটিয়ে আনেন।

হেগেল একে মনে করতেন '*বিকাশের* পরস্পরবিরোধী' প্রক্রিয়া। তাঁর মতে, সারসত্ত্বার বিকাশ তিন ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথমে "প্রতিফলন" যাতে ভিন্নতাগুলো পরস্পরের বিরোধী হয়ে দেখা দেয় এবং ক্রমে এদের মাঝে দ্বন্দ্ব আবির্ভূত হয়; এরপর প্রতীয়মানতা, যা *আঙ্গিক ও আধেয়র* সংগ্রাম, যেখানে প্রতিটি নতুন আঙ্গিক গভীরতর আধেয় নিয়ে আসে; আর সব শেষে বাস্তবতা, মানে কারণ ও কার্যের পারস্পরিক কাজ।

এই ধারণা মার্কসের চিন্তাতেও গুরুত্বপূর্ণ, এখানে কোনো জিনিসের সত্যটুকু যে প্রত্যক্ষভাবে সংবেদনে নাজেল হয়—এই ধারণা অস্বীকৃত।

স্বতন্ত্র (Individual)

দর্শনে *স্বতন্ত্র* বলতে বোঝায় *প্রত্যক্ষভাবে* দেয়া বিষয়, যা নিজের মাঝে সমস্ত টুকরো অংশের সমগ্রতা ধারণ করে, প্রকাশও করে, কিন্তু নিজে থাকে এই সব হতে আলাদা।

ধর্ম বা গোত্র সমাজ সার্বিকতায় জোর দেয়; পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ সাচ্চা বলে স্বতন্ত্রকে, যেমন মার্গারেট থ্যাচার বলেছিলেন: "সমাজের কোনো অস্তিত্ব নেই।"

মার্কস সামাজিক সমস্যা চর্চা ও তা বুঝতে কোনো জিনিসকে তার স্বতন্ত্রতা, বিশিষ্টতা এবং *সার্বিকতা* দিয়ে কবজা করবার পক্ষপাতি ছিলেন।

নির্ঘণ্ট

অ

অহং, অহংবাদ ৩৫, ৩৭, ৪৫, ৫১, ৫৯, ৬০

অধিকার

—রাজনৈতিক ৪৪, ৫৬

—মানুষের ১২, ৪৩-৪৬, ৪৮, ৫১

—ধর্ম চর্চার ৪৪-৪২

—মানব ৪৩-৪৬, ৪৮, ৮২

—নাগরিক ১১-১২, ১৯, ৪৩, ৪৫

আ

আইন ১১, ২০, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৫-৪৭, ৫১, ৫৪, ৫৮, ৬৩, ৭৮, ৮৭, ৮৮

—এবং ধর্ম ৪০

আত্মবিচ্ছিন্নতা ৫৫, ৫৮

ই

ইতিহাস ১০, ১৭, ৩২, ৪৩, ৫৪, ৫৭-৫৮, ৬৭-৬৮

ইহুদিবাদ ১২, ১৪, ২৯, ৪২-৪৩, ৫৪-৫৫, ৫৭, ৫৯-৬০

এ

একত্ববাদ ৫৭

খ

খ্রিষ্টানতত্ত্ব ১২, ৩০, ৩৮, ৪০-৪২, ৫৩, ৫৪, ৫৯

—এবং মানুষ ৪১

গ

গণতন্ত্র

—সামাজিক মুক্তির রাজনৈতিক ধরন হিসেবে ৩৮

চ

চার্চ ২৯, ৪১, ৫৬, ৮৩

—এবং রাষ্ট্র ৪০

চিঠিপত্রের গোপনীয়তা ৪৮

চিন্তা ২১, ৩৪-৩৫, ৪৪, ৫৯

জ

জমিদারি ১৮, ৫০

—এবং সামন্ততন্ত্রের কালে ব্যক্তি ৪৯-৫০

—উচ্ছেদ এবং শ্রেণী গঠন ৫১

জর্মন ১১-১২, ১৪, ২৫-২৭, ৩৯-৪০, ৬২, ৬৪, ৬৭-৬৯, ৭৫

জনগণ, জাতি

—সামন্ততন্ত্র এবং চরম রাজতন্ত্রের

অধীনে ৪৯
—রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ১৯, ৩৯, ৫০, ৮৭

ট

টাকা
—ব্যক্তিসম্পত্তির অধীনে বিচ্ছিন্নতার আঙ্গিক হিসেবে ৫৭-৫৮
—ব্যক্তি সম্পত্তির অধীনে টাকার ক্ষমতা ৫৪-৫৭
— ~ বিলোপের সম্ভাবনা ৬০

দ

দর্শন ২১; ৫৪, ৬৮

ধ

ধর্ম
—ধর্মতত্ত্ব ৩০, ৪২, ৫৪
—সারসত্তা এবং ~ ৩০
— ~ বিচ্ছিন্নতার উৎপাদ হিসেবে ৩৬-৩৭
— ~ বিলোপ, এর শর্ত ২৯-৩৩, ৩৭-৩৮, ৪২-৪৩, ৫০-৫২
— ~ এবং রাষ্ট্র ২৬, ২৯-৩১, ৩৩-৩৫, ৩৯-৪০
— ~ এবং রাজনীতি ২৯, ৩১, ৩৯
—দাপুটে ধর্ম ২৬, ৪০

প

পর্যালোচনা ২৭, ৫৪, ৫৭, ৬৬
পরিবার ৪৯, ৭৫
পেশা ৩৪, ৫৬
প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ৩৭, ৬৪

ফ

ফ্রান্স ২৮, ৩০, ৬৩, ৭৪, ৮৩

ব

বিজাতীয়, বিজাতীয়তা ২৬, ৩৫, ৩৯, ৪২, ৫২-৫৩, ৫৭, ৬০
বিশ্ববীক্ষা ৪২, ৫৯, ৬৭
বাইবেল ৪০-৪১, ৬৪
বিচ্ছিন্নতা ২৬, ৩৭, ৪১-৪৩, ৪৯-৫০, ৫৫, ৫৯, ৬২
ব্যক্তি ৩৫-৩৬, ৪১, ৪৬
ব্যক্তিসম্পত্তি ৩৩-৩৪, ৩৬-৩৮, ৪৬, ৫৮, ৬২
বিজ্ঞান ২৭

ম

মুক্তি
—রাজনৈতিক ২৫, ২৭, ২৯, ৩০-৩২, ৩৬-৩৭, ৪২-৪৫, ৪৮-৪৯, ৫১-৫২, ৭৮
—মানব ~ ৪৩, ৪৬, ৫২, ৫৫, ৮৯
—সার্বিক মুক্তি - ২৮

মানুষ, মানব সত্তা
—প্রজাতি সত্তা হিসেবে ৩৫, ৩৭, ৪১-৪২, ৪৭, ৫২, ৫৯-৬০
—ব্যক্তি হিসেবে ৪৭, ৫২
—বুর্জোয়া সমাজে ৫৮
—ব্যক্তি সম্পত্তির অধীনে ৫৮
—ধর্মে তার আত্ম-বিচ্ছিন্নতা ৪৪

য

যুক্তরাষ্ট্র ৩১, ৮২

যেসুইট ৫৮

র
রাষ্ট্র
—এবং সিভিল সমাজ ৩৮, ৫৪
—খৃষ্টান রাষ্ট্র ২৫-২৭, ৩০, ৩৮-৪০, ৭৯
—এবং ব্যক্তি ৫১
—রাষ্ট্রহীন ২৮, ৪৪
রাজতন্ত্র ৪০

শ
শিক্ষা ৩৪, ৮৩
শ্রম ৪৯, ৫১, ৬৫
—এর বিষয় ৫৫

স
সত্তা, অস্তিত্ব ৪২, ৬৬

সিভিল সমাজ
—রাষ্ট্র ও সমাজের বিরোধিতা এবং দ্বন্দ্ব ৩৬-৩৭, ৪৭, ৫০-৫১, ৫৭
—বুর্জোয়া উৎপাদন ধরনের অধীনে ৩৫-৩৬
—এবং নাগরিক ৪৫, ৪৮
—এর ভিত্তি ৪৬
সম্প্রদায় ২৬, ৩৫, ৩৭, ৪৫, ৪৭-৪৮, ৫০, ৬৩
সংবিধান ৩১, ৪৪-৪৭, ৪৯, ৮২
—ফ্রান্সে ~ ৩০
সাম্য ৪৫, ৪৭, ৬৪, ৭০
সামন্ততন্ত্র ৫১, ৯০
সম্পত্তি ৩৩-৩৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৮, ৬৯
সমাজ
—মধ্যযুগে ৫০
—এবং রাষ্ট্র ৪২
—এবং ব্যক্তি ৪৭, ৫২

সাহিত্য এবং পৌরাণিক নাম

লাওকুন—ট্রয়বাসি একজন পুরোহিত, দেবতাকে ক্রুদ্ধ করার ফলে দুটো বিশাল সাপ তাকে হত্যা করে।

শাইলক—শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের চরিত্র